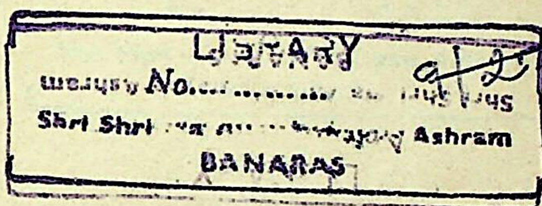
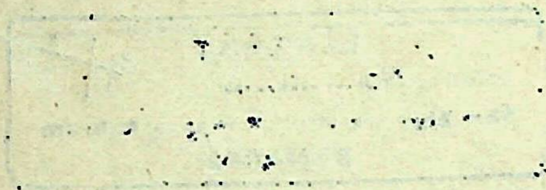
বাংলার সাধক বাউল





ইন্দিরা দেবী


LIBRARY
No.
Shri Shri
Ashram
BANARAS
3/122



বাংলার সাধক বাউল

শ্রীউমাশংকর সরকার

ইন্দিরা দেবী

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

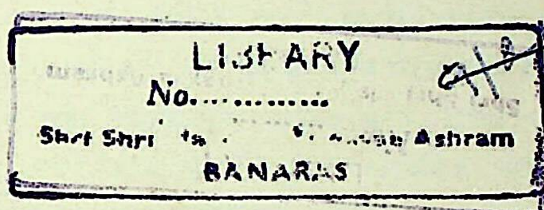
॥ প্রকাশক ॥
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
কলিকাতা—৯

॥ প্রথম মুদ্রণ ॥
॥ মহালয়া ১৩৬৯ ॥
॥ মূল্য চারি টাকা মাত্র ॥

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীবিভাবকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীবিমল চক্রবর্ত্তী
শ্রীশোভা চক্রবর্ত্তী
পরমাস্পদেষু



কলকাতা
মহালয়া
১৩৬৯

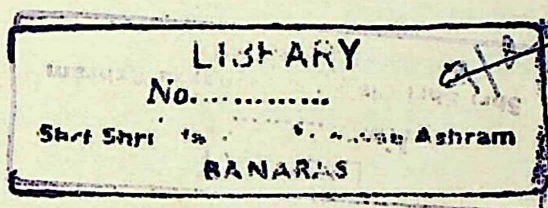
॥ প্রকাশক ॥
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
কলিকাতা—৯

॥ প্রথম মুদ্রণ ॥
॥ মহালয়া ১৩৬৯ ॥
॥ মূল্য চারি টাকা মাত্র ॥

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীবিভাষকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

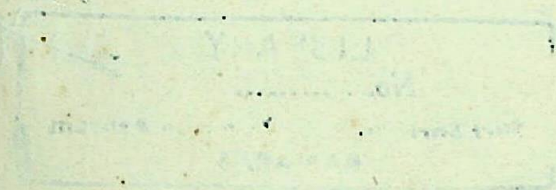
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীবিমল চক্রবর্ত্তী
শ্রীশোভা চক্রবর্ত্তী
পরমাস্পদেষু

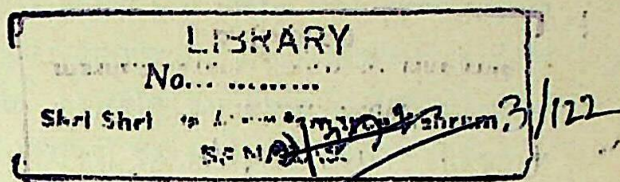


কলকাতা
মহালয়া
১৩৬৯









ধর্মবোধি

জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপকরণ ধর্ম। ধর্মমত এবং ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়। তাই কোনো জাতির পরিচয় জানতে হলে তার সংস্কৃতির উপাদান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গোড়াতেই স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া উচিত। যে সব উপাদান নিয়ে জাতির সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে ধর্ম। মানব-সভ্যতার প্রথম প্রভাতে না হলেও প্রাথমিক স্তরেই মানুষের মনে ধর্মবোধের স্ফুরণ ঘটেছিল। পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের পরিচয় যত ঘনিষ্ঠতর হতে লাগলো, তার অভিজ্ঞতার পরিধি যত বিস্তৃততর হতে লাগলো, ততই মানুষের মনে অভাবিতপূর্ব নানাভাবের প্রকাশ সম্ভব হলো। প্রকৃতির মধ্যে মানুষ কখনও দেখতে পেলো রুদ্রের প্রকাশ, কখনও অনুভব করলো শিব ও সুন্দরের অস্তিত্ব। কখনও অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠতো মানুষ; কখনও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে আশান্বিত হয়ে উঠতো। আদিম যুগের মানুষ অনুভব করলো তার সীমিত বুদ্ধি নিয়ে এমনি অদৃশ্য কোনো শক্তির অস্তিত্ব —যার নির্দেশে ও নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির বিভিন্ন বিচিত্র লীলার প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে। শ্রদ্ধায়, ভয়ে, ভক্তিতে, বিস্ময়ে মানুষ নিজের মনের অজ্ঞাতে সর্বশক্তির আধার সেই নিয়ন্ত্রণকারীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলো তার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। তারপর স্বাভাবিক ক্রমাভিব্যক্তির স্তর অতিক্রম করে মানুষের মনে প্রকাশিত হলো ধর্ম সম্বন্ধে গভীরতর অনুভূতি, দার্শনিক চিন্তাধারা। চিন্তাধারার অভিব্যক্তির বহু স্তর অতিক্রম করে মানুষ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজ্যের যে

অঞ্চলে প্রবেশ লাভ করেছে তার পিছনে রয়েছে দীর্ঘ শতাব্দীর ইতিহাস। সেই ইতিহাসের গতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে অসমতালে চিহ্নিত হয়েছে এই গতিপথ। কখনও প্রচণ্ডতালে অনেকখানি গতিবেগ সংগ্রহ করে এই চিন্তাধারা প্রসারিত হয়েছে, আবার কখনও এর গতিধারায় দেখা দিয়েছে শিথিল মন্থরতা। কখনও যুক্তির প্রাধান্য মেনে নিয়ে মানুষ শুষ্ক জ্ঞানচর্চার সাহায্যে অজানা রহস্যের সমাধানে প্রয়াসী হয়েছে। কখনও তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের সাহায্যে মানুষ চেষ্টা করেছে অনির্দেশ্য শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করতে, আবার কখনও বা ভক্তিবিশোধিত অন্তরে আত্ম-সমর্পণের পথে মানুষ চেষ্টা করেছে অজ্ঞেয় শক্তির সান্নিধ্য লাভ। এমনি ভাবে বিভিন্ন পথে মানুষ অনির্দেশ্য সর্বত্রগ সেই মহাশক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছে। দৃশ্যমান জগতের বাইরে, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য একটি জগৎ কল্পনা করে, মানুষ সেই জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছে। মানুষের এই সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টি থেকে সম্ভব হয়েছে ধর্ম আর বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

সভ্যতার পথে মানুষের জয়যাত্রা সুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে এই ধর্মবোধির উন্মেষ হয়েছিল। আদিম যুগের মানুষ প্রকৃতির শক্তির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে সন্ধান করেছিল সর্বনিয়ামক শক্তির আধারকে। তারপর চিন্তাশক্তির প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ঐশী শক্তির স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের মনে গভীরতর উপলব্ধির স্ফুরণ সম্ভব হয়েছে। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সাধারণ বোধের অতীত সেই মহাশক্তির সঙ্গে তার ব্যবধানের পরিধি সঙ্কীর্ণ-তর করার চেষ্টা করেছে। গাছ পাথর, জন্তু জানোয়ারকে অজানা সেই শক্তির প্রতীক ভেবে তারা তাদের উপাসনা করার রীতি-নীতি গড়ে তুললো—তারপর ক্রমে মানুষ নিজের অস্তিত্বের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে শিখলো। গড়ে উঠলো মন্দির, গির্জা, মসজিদ, সিনাগগ। রচিত হলো মন্ত্র, লেখা হলো রাশিকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ। সমাজে আবির্ভাব ঘটলো নতুন শ্রেণীর—পুরোহিত,

মৌলবী, পাদ্রী। ক্রমশঃ ধর্ম-ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হতে লাগলো। মূর্তিপূজা—তার সঙ্গে এলো যাগযজ্ঞ, পশুবলি। আবার পরিশোধিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেও মানুষ অজ্ঞেয় বিস্ময়কর এই শক্তির স্বরূপ নির্ধারণে প্রবৃত্ত হলো। এর ফলে সৃষ্টি হলো অমৃতের সন্ধানকারী উচ্চাঙ্গের ভাবসমৃদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারা। মানুষ নিজেকে অমৃতের পুত্র বলে ভাবতে শিখলো। তার কানে ভেসে এলো আশার বাণী ঃ

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তসথুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসা পুরস্তাৎ।"

এমনি ভাবে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন স্তরে মানুষের ধর্মবোধ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ধর্মবোধের বিকাশের মধ্যে সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। ধর্মই সংস্কৃতির একমাত্র বাহন নয়। ভাষা, সাহিত্য, শিল্পের মাধ্যমে সংস্কৃতির প্রকাশ হয়ে থাকে, সুতরাং কোনো জাতির সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হলে সামগ্রিকভাবে সেই জাতির ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস, অনুভূতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কার, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য সব কিছুর পরিচয় নেওয়া উচিত। সংস্কৃতির বাহন এবং উপাদান বলে যাদের গণ্য করা হয় তাদের মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাস নিঃসন্দেহে অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। অন্যান্য উপকরণের তুলনায় ধর্মের সার্বজনীনতা অনেক বেশী। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল নরনারীর মনে ধর্ম যতখানি সহজে এবং যত ব্যাপকভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে —সাহিত্য অথবা শিল্পের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সাহিত্য ও শিল্পের আবেদন একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু ধর্মের প্রভাব সর্বত্র প্রসারী—সুতরাং ধর্মজীবনে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন যত সহজে এবং যত গভীরভাবে হয়ে থাকে, অন্য কোনো উপাদান ততখানি পরিচয় বহন করতে পারে না।

সংস্কৃতির বাহন হিসেবে ধর্মের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে ধর্মের গতি ও প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। তাছাড়া যুগে যুগে তার রূপেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ একই ধর্মের অবলম্বী হতে পারে কিন্তু তাঁদের ধর্মবোধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সকল স্তরের নরনারীর ধর্মবোধ একই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত নয়। এ ছাড়া দেখতে পাওয়া যাবে যে ধর্মের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে এমনি সব ধ্যান ধারণা বিশ্বাস অনুভূতি—যাদের মধ্যে খানিকটা ঐক্য থাকলেও পরিপূর্ণ সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই ধর্মের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জীবনের যে প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে কখনও কখনও সংহতি এবং সামঞ্জস্যের অভাব ঘটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

বাঙ্গালী সংস্কৃতির মূল

বাঙ্গালীর ধর্ম আশ্রয় করে বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিক উভয়েই এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে আলোকপাত করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে আমরা এই ধারণাই পোষণ করে এসেছিলাম যে আমাদের সংস্কৃতি যে বিশিষ্ট ধর্মীয় ভাবধারা দ্বারা পুষ্টিলাভ করে এসেছে তা বিশেষভাবে আর্য ব্রাহ্মণ্য প্রভাব-সঞ্জাত ভাবধারা। কিন্তু এই ধারণার অভ্রান্ততা সম্পর্কে আজ সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়েছে। আজ এ তথ্য কারো অবিদিত নেই যে আমাদের সংস্কৃতির ধারা আর্য এবং আর্যেতর এ দু'টি ভাবধারা দ্বারাই পুষ্টিলাভ করেছে। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে আর্য উপনিবেশ যখন প্রথম স্থাপিত হলো তার বহু শতবর্ষ পরে পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল।

আর্যরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে এলেন তখন থেকে এবং সম্ভবতঃ তারও আগে থেকে পূর্ব ভারতে আর্যেতর যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল,

সেই সংস্কৃতি বহু শতবর্ষ পর্যন্ত আর্য প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য রচনা করতে পেরেছিল। তারপর বহু শতবর্ষ পরে যখন আর্যজাতি পঞ্চনদ জনপদ থেকে ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয়ে পূর্ব ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যত হলো, তখন এই অঞ্চলে আর্যেতর সভ্যতা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সভ্যতারূপে স্বীকৃতি লাভ করলো। আর্যরা ভারতে প্রথম প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আর্য এবং আর্যপূর্ব সভ্যতার মধ্যে যে সংঘাতের সূচনা দেখা দিয়েছিল, বহু শতবর্ষ পরে সেই সংঘাতের পুনরাবৃত্তি ঘটলো পূর্ব ভারতীয় জনপদে। এই সংঘাতের খুঁটিনাটি তথ্য আমাদের কাছে আজও অজানা—তবু এই সংঘাতের পরিণাম সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা অসম্ভব নয়। আর্য সাহিত্যে পূর্ব ভারতের জনপদ এবং তাদের অধিবাসীদের সম্বন্ধে যে ধরনের মন্তব্য স্থান পেয়েছে তার থেকে প্রমাণিত হয় এই সংঘর্ষ কতটা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত আর্য সংস্কৃতির বাহকরাই জয়ী হয়েছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা আর্যেতর সভ্যতার স্রোতধারাকে অবলুপ্ত করে দিতে পারেননি। তার ফলে পূর্ব ভারতে যে সভ্যতা পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল তার মূলে আর্য এবং আর্যেতর উভয় সংস্কৃতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। কোন্ সংস্কৃতির প্রভাব বেশী, কার প্রভাব কম সে বিচার সম্ভব নয় কিন্তু একথা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে সামাজিক রীতি-নীতি এবং ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে আর্যেতর সংস্কৃতির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। আমরা আর্যপ্রধান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বটে কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনস্রোতে আর্যেতর সংস্কৃতির ধারাও অনেকখানি গতিবেগ সঞ্চার করেছে। আমাদের সমাজে যে সব অনুষ্ঠান এবং ব্রত পূজা উৎসব পালিত হয়ে থাকে তার মূলে আর্যেতর প্রভাব সুস্পষ্ট। আমাদের সমাজ জীবনের যে ক্ষেত্র চাষীর মাঠে, ধানের গোলায়, গৃহস্থের আঙ্গিনায়, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, নদীর ধারে, শ্মশানে প্রসারিত,

সেইখানে এমন সব বিশ্বাস, সংস্কার, দেব দেবীর ছড়াছড়ি যারা নিছক আর্যেতর চিন্তাধারার প্রতিনিধি। ধানগাছ, দূর্বা, কড়ি আমাদের আচার অনুষ্ঠানে যেরূপ অবাধে প্রবেশ অধিকার লাভ করেছে—তার মূলে আর্যেতর প্রভাব অনস্বীকার্য। বহুতর দেব দেবীর মূর্তিপূজা আমাদের সমাজে প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায় যাদের কল্পনা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের অন্তরে স্থান লাভ করেনি, তারা একান্তভাবে বাংলার আদিবাসী গ্রামীণ চিন্তাধারার সৃষ্টি।

আর্য ও আর্যেতর সংঘর্ষে আর্য সভ্যতা জয়লাভ করলেও আর্যেতর সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। সংঘর্ষের অবসানে এলো সমন্বয়ের যুগ। ভারতবর্ষের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই সমন্বয়ধর্মীতাই প্রথম চোখে পড়ে। ইতিহাসের সূচনাকাল থেকে বিদেশাগত যে সব জাতি, উপজাতি ভারতবর্ষে এসেছিল, ভারতবর্ষ তাদের কাউকে পর বলে দূরে সরিয়ে রাখেনি। তাদের সঙ্গে তারা বিভেদ ঘুচিয়ে আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করেছে। পরবর্তীযুগে আর্য সভ্যতা যখন পূর্ব ভারতে বিস্তৃতিলাভে উদ্যত হয়েছিল তখন এই মনোভাবই আর্যেতর সংস্কৃতিকে লোপ করার চেষ্টায় বিরত ছিল, বরং উভয় সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের আকাঙ্ক্ষাই তাদের উদ্যমকে সার্থকতার পথে চালিত করেছিল। তাই সমন্বয়ের ধারায় অবগাহন করে বাঙ্গালী তার সংস্কৃতিকে যে ভাবে গড়ে তুলেছে তার মূলে আর্য ও আর্যপূর্ব প্রভাব উভয়েই সক্রিয়ভাবে কার্যকরী।

যারা সমাজ বিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা বাঙ্গালী সংস্কৃতির কোন্ ধারাটি আর্যপ্রভাবপুষ্ট, আবার কোন্ কোন্ ধারায় আর্যেতর সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট—সে সন্ধান দিতে পারবেন। বাংলার দেব দেবীদের উপরে তাঁদের সন্ধানী শ্যেনদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কোন্ দেবতা বৈদিকযুগের আর্যদের উপাস্য ছিলেন, কোন্ দেব দেবীর উপাসনা আর্যেতর সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে, আবার কোন্ কোন্ দেব দেবী আর্যেতর সমাজে উদ্ভূত হয়েও ক্রমে আর্য সমাজ

কর্তৃক উপাস্য দেব দেবীর মধ্যে স্থানলাভ করেছেন—এসব সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক বহু ইঙ্গিত ঐতিহাসিক এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে পাওয়া যায়। শুধু দেব দেবীর উপাসনার ক্ষেত্রেই আর্য-আর্যেতর সভ্যতার যুগ্মপ্রভাব দেখা যায় না, সামাজিক রীতি নীতি ক্রিয়া অনুষ্ঠান সর্বত্রই স্বতন্ত্র দু'টি সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আর্য ও আর্যেতর প্রভাবপরিপুষ্ট বাঙ্গালীর মানসক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণেই বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই। দু'টি স্বতন্ত্র ধারা পাশাপাশি প্রবহমান হয়ে শেষ পর্যন্ত যখন পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য কাটিয়ে একটি স্ফীতকায় স্রোতধারায় পরিণতি লাভ করলো—তখন তাতে একদিকে দুর্বার গতিবেগ সঞ্চারিত হলো, অপরদিকে বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যে সেই স্রোতধারা অভাবনীয়রূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বাঙ্গালীর সামাজিক উৎসবে, পূজা অনুষ্ঠানে, শিল্পকলায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে। এই বৈচিত্র্যের প্রভাব ধর্মজীবনেও অনুভূত হয়েছিল। বাঙ্গালীর ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্রমিক অভিব্যক্তির ধারা আলোচনা করলে দেখা যাবে বহুতর চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবন-দর্শনের প্রভাবে সার্থক পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে বাঙ্গালীর ধর্মমত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিবর্তন।

ধর্মমতের গতি ও প্রকৃতি

বাঙ্গালীর ধর্মমতের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করলে যে তথ্যটি সবচেয়ে আগে মনে হয় সেটি হলো মতবাদের বিভিন্নতা। যুগ থেকে যুগে প্রসারিত ধর্মীয় চিন্তাধারায় ধারাবাহিকতার অভাব নেই। কিন্তু মূলতঃ এই চিন্তাধারার মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও এই ধর্মমত বিভিন্নতার স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কত বিভিন্ন মত এবং চিন্তাধারার সাগর-সঙ্গম বাঙ্গালীর সংস্কৃতি সে কথা ধর্মীয় চিন্তাধারার উৎস এবং অভিব্যক্তি আলোচনা করলে সংশয়াতীতরূপে

উপলব্ধি করা যায়। যে সকল উপাদান নিয়ে বাঙ্গালীর ধর্মগত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার সামগ্রিক রূপের মধ্যে ঐক্য এবং সামঞ্জস্যের কোনো অভাব নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রত্যেকটি উপাদান স্বাতন্ত্র্যধর্মী এবং এদের আশ্রয় করে বিভিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ গড়ে উঠেছে। ধর্মীয় চিন্তাধারার এই বৈশিষ্ট্য আকস্মিক ঘটনাসম্ভূত নয়। সামাজিক জীবনের এই স্রোতধারা স্বাভাবিকভাবে এবং অনিবার্য কারণে আপন স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসেও এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি যে মহাসমুদ্র রচনা করেছে, মূলতঃ ঐক্য সত্ত্বেও সেখানে প্রত্যেকটি স্রোতধারা আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর গ্রহণশীলতা।

ভারতীয় সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালী সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও গভীরভাবে অনুভূত হয়েছে। ভারতবর্ষ কোনো কিছুকে পর মনে করে দূরে রাখেনি। দূরকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে ভারতবর্ষ তাকে আত্মসাৎ করে বাইরের সঙ্গে তার ব্যবধানের দূরত্ব লোপ করার প্রয়াস পেয়েছে। বাঙ্গালী সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই গ্রহণশীলতার মনোভাব সক্রিয়ভাবে কার্যকরী ছিল—এই তথ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বাঙ্গালী সংস্কৃতি তাই বহু সাধনার ধারায় পুষ্ট হয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে।

ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—এর মৌলিক ঐক্য। আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের জীবনে বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। ভাষা, পরিচ্ছদ, জনতত্ত্ব, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ প্রভৃতি বিষয়ে বহুতর বৈচিত্র্য ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতিকে বিচিত্রধর্মী করে তুলেছে। কিন্তু এই বৈচিত্র্য ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় বহন করে না। সহজদৃশ্য এই সব বৈচিত্র্যকে ছাপিয়ে উঠেছে একটি সুদৃঢ় অনমনীয় ঐক্যবোধ। ভারতীয় সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য—বিভেদের মধ্যে মিলন, বৈচিত্র্যের

মধ্যে ঐক্য। ভারতীয় সংস্কৃতির এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন বাঙ্গালী সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন যুগে জনস্রোতের যে ধারা বাংলার জনপদে এসে মিলিত হয়েছে, সেই ধারার চিহ্ন বাঙ্গালীর সংস্কৃতির রূপায়ণে সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন জাতি থেকে উদ্ভূত যে জনসমাজ নিয়ে বাংলা দেশ গড়ে উঠেছে—সেই জনসমাজের উপাদান বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বাঙ্গালী সংস্কৃতি মৌলিক ঐক্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যাদের নিয়ে বাঙ্গালী জনসমাজ গড়ে উঠেছে—তারা সকলে আদিতে এক ভাষাভাষী ছিল না। জাতিতত্ত্বের দিক থেকেও এদের মধ্যে বিভিন্নতার অন্ত ছিল না। এরা সকলেই সভ্যতার দিক থেকে সমস্তরভুক্ত ছিল তাও বলা যায় না। সভ্যতার সঙ্গে কোনই পরিচয় ছিল না এমনি জাতি অথবা উপজাতি বাংলার জনসমাজ গঠনে এগিয়ে এসেছিল সে রকম প্রমাণের অভাব নেই কিন্তু বাঙ্গালী সংস্কৃতির গঠনে কারো অবদানই উপেক্ষিত হয়নি। বিচিত্র স্তরের সভ্যতা, বিচিত্র শ্রেণীর মানুষ নিয়ে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

বহু জাতির সংমিশ্রণে যে সমাজ ও সংস্কৃতি গঠিত হয়েছে সে সংস্কৃতিতে বহু উপাদান স্থান লাভ করেছিল—এইটিই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। কোন্ গোষ্ঠীর অবদান কতখানি তা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয় কিন্তু বাঙ্গালীর সংস্কৃতির পিছনে বহু শতাব্দী-সঞ্চিত মানব-গোষ্ঠীর প্রয়াস অন্তর্নিহিত রয়েছে—এ তথ্যের অভ্রান্ততা মেনে নিতে কোন কষ্ট হয় না।

বাংলার সংস্কৃতি বৃহত্তর ভারতবর্ষীয় সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙ্গালী সংস্কৃতির স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। আর্যাবর্তে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে একাধিক বিষয়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতির পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। এই পার্থক্য দ্বারা উভয় সংস্কৃতির মধ্যে কোনো মৌলিক ব্যবধান রচিত হয়নি। কিন্তু তা হলেও বাংলা দেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না।

এই বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে আর্যরা আর্যাবর্তের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে তাঁদের প্রভুত্ব অনেক পরে বিস্তার করেছিলেন এবং তার ফলে আর্য সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন থেকে বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি আপন স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিকাশলাভের সুযোগ পেয়েছিল। তারপর দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে যখন আর্যজাতি অবশেষে পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে তাঁদের বসতি স্থাপন করলেন, তখন বাংলা দেশের আর্যেতর সভ্যতাপুষ্ট চিন্তাধারা এবং সামাজিক জীবন পরিপূর্ণতার দিকে এতখানি এগিয়ে গেছে যে, তাকে উৎখাত করে আর্য সভ্যতার পক্ষে তার সর্বময় প্রাধান্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এই কারণেই বাংলা দেশের সভ্যতাকে পরিপূর্ণরূপে আর্য সভ্যতার প্রতিচ্ছবি-রূপে বর্ণনা করলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হবে।

ধর্মজীবনকে আশ্রয় করে বাংলা দেশে যে সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল, তার পরিচয় আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয়নি। প্রাচীনতম যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় কোনো তথ্যই আমাদের জানা নেই। তবে প্রাচীনতম যুগের এই সভ্যতা ও ধর্ম আর্যভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়নি একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বোধায়ন ধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হয় যে যখন এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তখন বাংলা দেশে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করেনি। এই সম্পর্কে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় যে গুপ্তযুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম আর্য সভ্যতা বাংলা দেশে বিস্তার লাভ করেছিল। গুপ্ত শাসনকাল থেকে বাংলা দেশের ধর্মজীবনের এবং সংস্কৃতির গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে মোটামুটি ধারণা করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রাক্-গুপ্ত যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি জীবনের কোনো চিত্রই উদ্ঘাটন করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সেই যুগের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানের কোনো পরিচয় পাওয়া না গেলেও অনুমান করা যেতে পারে যে পরবর্তী যুগে আর্য সভ্যতা যখন বাংলা দেশে প্রবেশ

করেছিল এবং বাঙ্গালী জাতি যখন সেই আর্য সংস্কৃতির প্রবাহে ধারাস্নান করেছিল, তখন তারা আর্যপূর্ব সংস্কৃতির যে ক্ষীণতর ধারায় এতকাল নিজেদের নিমজ্জিত করে রেখেছিল সেই ধারার কথা তারা ভুলতে পারেনি। বর্তমানকালে বাংলার ধর্মজীবনের সঙ্গে ভারত-বর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের ধর্মজীবন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে যে প্রভেদ দেখা যায়, সম্ভবতঃ কতকাংশে এ প্রভেদ বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবের ফল। পরবর্তীকালে আর্য সংস্কৃতির প্রভাবে যখন বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছিল, তখনও প্রাচীনতর আর্যপূর্ব সভ্যতার প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। এইখানেই বাঙ্গালী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।

বেদ-বিরোধী ধর্মের উদ্ভব

পূর্ব ভারতে বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মমতের অভ্যুদয় ঘটেছিল তা আকস্মিক ঘটনা নয়। আর্য সভ্যতার প্রবাহ থেকে দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে পূর্ব ভারতের যে স্বতন্ত্র দৃষ্টি ভঙ্গী গড়ে উঠেছিল, তার ফলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম-বিরোধী ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত পূর্ব ভারতে সম্ভব হয়েছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং মতবাদের ক্ষেত্রে বাংলা তথা পূর্ব ভারতের এই স্বকীয়তা আর্য-পূর্ব সভ্যতার প্রভাব।

গুপ্তশাসন কাল থেকে বাংলার ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের যে চিত্র সাধারণতঃ অঙ্কিত করা হয় তার প্রধান উপজীব্য আর্যীকরণ। গুপ্তশাসন যুগের যে সব শিলালেখ পাওয়া গেছে তাদের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে বাংলা দেশে বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হতো। ঐ যুগে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান, দেবমন্দির নির্মাণ করা হতো এবং অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হতো। গুপ্তযুগে বাংলা দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এ সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা সমর্থিত।

ঐ যুগে পৌরাণিক দেব দেবীর পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল—এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষেও ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। এই সব দেব দেবীর পূজার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক বহু আখ্যান প্রচলিত হয়েছিল। তাম্রশাসনের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, সে যুগে ইন্দ্র বিষ্ণু ব্রহ্মা লক্ষ্মী প্রভৃতি দেব দেবী উপাস্য বলে বিবেচিত হতেন। যে সব পৌরাণিক কাহিনী ঐ যুগে প্রচারিত হয়েছিল তাদের মধ্যে বলিরাজ এবং কর্ণের দানশীলতা, অগস্তের সমুদ্র-শোষণ, পরশুরামের ক্ষত্রিয়-নিধন, রামচন্দ্র, পৃথু, ধনঞ্জয়, যযাতি, অম্বরীষ প্রভৃতির কাহিনী উল্লেখযোগ্য। গুপ্তশাসন যুগে বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্মের প্রসার সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঐ যুগে ভাগবত সম্প্রদায়ের উপাস্য বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে রূপান্তর লাভ করে ছিলেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু উপাখ্যান এই সময় থেকে বাংলা দেশে প্রচারিত হয়েছিল। বিষ্ণু ভিন্ন অন্য যে দেবতা ঐ যুগে পূজিত হতেন তিনি শিব। সদাশিব অর্ধনারীশ্বর ধূর্জটি মহেশ্বর ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ইনি পূজিত হতেন। বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে যেমন বহুতর পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচারিত হয়েছিল, তেমনি শিবকে আশ্রয় করে জনসাধারণের মধ্যে বহু কাহিনী প্রচার লাভ করেছিল।

গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগে বাংলা দেশে বহু বিষ্ণুমন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং একাধিক নরপতি এই ধর্মের শরণাগত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কৃষ্ণলীলার জনপ্রিয়তার পরিচয় অঙ্কিত রয়েছে পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে। বিষ্ণুমন্দির ছাড়া এই যুগে শিবমন্দির এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এরূপ প্রমাণের অভাব নেই। পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে শিবের একাধিক মূর্তি উৎকীর্ণ দেখতে পাওয়া যায়। শিবপূজার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে শক্তিপূজারও প্রচলন হয়েছিল। সপ্তম শতকের শেষ ভাগে রচিত দেবীপুরাণ নামক গ্রন্থের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলা দেশের রাঢ় অঞ্চলে বামাচারী শাক্ত

সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে একটি চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। এই চিত্রে একটি মনুষ্যমূর্তি তরবারির দ্বারা নিজের মস্তক ছিন্ন করতে উদ্যত এইরূপ দৃশ্য উৎকীর্ণ রয়েছে। কেউ কেউ অনুমান করেন যে এই চিত্র দ্বারা শক্তির উপাসক কোন ভক্ত দেবীর নিকট আত্ম-নিবেদন করতে উদ্যত হয়েছেন, চিত্রশিল্পী একথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব মাত্র এই তিনটি ধর্মমতই বাংলা দেশে গুপ্তাধিকার যুগ থেকে প্রচলিত হয়নি। শিব এবং বিষ্ণু ছাড়া আরো পৌরাণিক দেব দেবী এই যুগে পূজিত হতেন এমন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। পৌরাণিক দেব দেবীদের মধ্যে অন্ততঃ কার্তিক ও সূর্যের পূজা বহুকাল থেকে বাংলা দেশে প্রচলিত হয়েছিল —সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

বাংলা দেশের ধর্মজীবনের প্রাণকেন্দ্র শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্মকে আশ্রয় করেই আবর্তিত হয়নি। ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবেদনও প্রাচীন বাঙ্গালীর মনকে স্পর্শ করেছিল। ঠিক কবে বৌদ্ধধর্ম বাংলা দেশে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল তা সংশয়াতীতরূপে জানা সম্ভব নয়। তবে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশেও বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের বহুল প্রচলন হয়েছিল। পরবর্তী পাঁচশো বছর ধরে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার অব্যাহত গতিতে চলেছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন যখন ভারত পর্যটনে এসেছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান ধর্মরূপে স্বীকৃত হতো। চীন পরিব্রাজকের মতে তাম্রলিপ্তি নগরীতে বাইশটি বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত ছিল। এর দু'শো বছর পর যখন হিউয়েন সাঙ বাংলা দেশে এসেছিলেন, তখনও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। তিনি বাংলার বৌদ্ধ-ধর্মের একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এই সময় বহু বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের অস্তিত্ব ছিল। এই সব সঙ্ঘারামে শুধু যে ধর্মচর্চাই হতো তা নয়, উচ্চশিক্ষার কেন্দ্ররূপেও এরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

হিউয়েন সাঙ বর্ণিত বাংলা দেশে শুধু যে বৌদ্ধধর্মেরই প্রচলন ছিল তা নয়—তিনি তাঁর বর্ণনায় জৈন এবং হিন্দু ধর্মের প্রচলনের কথাও উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের পাশাপাশি প্রচলন থাকলেও এই তিনটি ধর্মমতের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যই সর্বজনস্বীকৃত ছিল। এই সময়ের বাংলার বৌদ্ধাচার্যগণ জ্ঞানানুশীলন এবং ধর্মনিষ্ঠা দ্বারা সমগ্র বৌদ্ধ জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অষ্টম শতকে পালশাসন যুগে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তৃততর হয়েছিল। পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বাংলা দেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ভারতবর্ষের বাহিরে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। উত্তরে তিব্বত নেপাল, দক্ষিণে যবদ্বীপ সুমাত্রা মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি পালরাজগণের অসাধারণ বৌদ্ধধর্ম-প্রীতির পরিচয় বহন করে। পাল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইসব সঙ্ঘারামে শিক্ষাপ্রাপ্ত বৌদ্ধধর্মাচার্যগণের অক্লান্ত চেষ্টায় পূর্ব ভারতে এবং ভারতের বাহিরে দেশ-দেশান্তরে প্রসার লাভ করেছিল।

বৌদ্ধধর্ম ছাড়া বাংলা দেশে জৈনধর্মের প্রচলন হয়েছিল। প্রাচীন জৈনধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে যে মহাবীর ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে রাঢ়দেশে এসেছিলেন কিন্তু এই দেশের অধিবাসীরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছিল। জৈনগ্রন্থে উল্লিখিত এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে কোন কোন মহলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। জৈনধর্ম বাংলা দেশে প্রথম কবে প্রচারিত হয়েছিল, সেকথা সঠিক-ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অশোকের রাজত্বকালে বাংলা দেশে জৈনধর্মের প্রচলন হয়েছিল। বৌদ্ধ কিংবদন্তীর অভ্রান্ততা সকলে স্বীকার করেন না; সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাংলা দেশে জৈনধর্ম সত্যই প্রচলিত ছিল কিনা সে সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ রয়েছে, কিন্তু অশোকের সমসাময়িক কালে না হলেও অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে যে জৈনধর্ম বাংলা

দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণের কোন অভাব নেই। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ কল্পসূত্রমতে তাম্রলিপ্ত, কোটিবর্ষ, পুণ্ড্রবর্ধন জৈনধর্মের কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে ঐ স্থানে জৈন বিহারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, গুপ্তশাসন যুগ থেকে বাংলা দেশে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী মতবাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। এই সময় থেকেই শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং পৌরাণিক বহু দেব দেবীর পূজার বহুল প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের আবেদন বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলার ধর্মজীবন প্রধানতঃ এই তিনটি ধর্মমতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কোন্ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কত ছিল তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা পড়ে মনে হয় উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে বৌদ্ধ এবং জৈনদের তুলনায় ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল বেশী। সপ্তম শতকে জৈনধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। কিন্তু তারপর থেকে জৈনদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। এইভাবে বাংলার জনসমাজ বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী এই দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পাল রাজত্ব আরম্ভ হবার পূর্বাবধি এই ছিল বাংলার ধর্মজীবনের মোটামুটি পরিচয়।

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন

পাল রাজত্বকালে পাল নরপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল একথা আমরা আগে বলেছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। পালরাজারা বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচলন করেছিলেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধর্ম মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানা স্থানে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু সমসাময়িক যুগে

অন্যান্য অঞ্চলে কিছুকাল থেকে বৌদ্ধধর্মের স্রোতধারা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছিল। পালরাজারা সেই স্রোতধারার গতিবেগ আর সঞ্চার করতে পারেননি। এই যুগে পূর্ব ভারত ছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল; সুতরাং পাল-শাসিত বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র বাংলা দেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে এই স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছিল।

অষ্টম শতকের বাংলা দেশে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আমরা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করে বাংলা দেশের স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছিল একথা বলেছি; কিন্তু এ বৌদ্ধধর্মকে পুরোপুরি বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম বলে মনে করলে ভুল হবে। গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন পরবর্তীকালে অনিবার্য কারণে সেই ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রথম দিকে এই পরিবর্তন শুধু বহিরঙ্গাশ্রয়ী ছিল; কিন্তু ক্রমে এই পরিবর্তনের প্রভাব বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের মর্মস্থানে অনুভূত হতে লাগলো। তার ফলে ঘটলো বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর। সপ্তম শতকে বাংলা দেশে যে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল বলে হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করে গেছেন, সেই ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের অনেকখানি পার্থক্য। যে সব কারণে এই পার্থক্যের উৎপত্তি হয়েছিল তার মধ্যে ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি একটি কারণ। এ ছাড়া আর যে সব কারণ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে বাঙ্গালীর নিজস্ব চিন্তাধারার প্রভাবকে অন্যতম কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। এই চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলে হয়তো দেখা যাবে যে সুপ্রাচীন কাল থেকে আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব বাঙ্গালীর মনকে এত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল যে, তার ফলে বাহিরের যে ভাবধারা যখনি বাংলা দেশের তটভূমিতে আঘাত করেছে, বাঙ্গালী সেই ভাবধারাতে আত্ম-বিলোপ ঘটতে দেয়নি। নিজস্ব ঐতিহ্য ও দৃষ্টি ভঙ্গীর

স্বকীয়তার দ্বারা বাঙ্গালী সেই ভাবধারাকে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত করেছে। এই কারণেই বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে রূপের সঙ্গে বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের সাদৃশ্য থাকলেও সাযুজ্য ছিল না।

ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তন দ্বারা শুধু বৌদ্ধ-ধর্মই প্রভাবিত হয়নি। ব্রাহ্মণ্যধর্মও পরিবর্তনের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। এই পরিবর্তন আকস্মিক ঘটনা বলে গণ্য হতে পারে না, কিন্তু সেই যুগের ধর্ম ও সমাজ জীবনের যে চিত্র আমরা পাই তা থেকে পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন কিন্তু এ সম্পর্কে দু'টি একটি এমন তথ্য পাওয়া যায় যার সাহায্যে পরিবর্তনের কারণ সঠিক ভাবে নির্দেশ করতে না পারলেও কারণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুমান করা চলে। সপ্তম শতক থেকে সুরু করে এ পরিবর্তনের ধারা একাদশ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময় বাংলার জনসমাজ আয়তন এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, যাদের নিয়ে জনসমাজের এই কলেবর বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল তথাকথিত নিম্নস্তরের মানবগোষ্ঠী। জনতত্ত্বের মাপকাঠিতে এরা আর্য বলে স্বীকৃত নয়। বাংলার জনসমাজে যখন এই প্রাচীন আর্যেতর মানবগোষ্ঠী স্থানলাভ করলো, তখন তারা সঙ্গে করে নিয়ে এল কৌম সমাজের বিশেষ ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি। এই রীতিনীতি এবং ধ্যান-ধারণার প্রভাবে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শ প্রভাবিত হয়েছিল।

সপ্তম শতক থেকে যখন বাংলা দেশে এবং পূর্ব-ভারতে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন হচ্ছিল সেই সময় ভারতবর্ষের অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং প্রসার ক্রমশঃ অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল। ফা হিয়েনের সময় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পূর্বের তুলনায় অনেকখানি ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছিল। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ যখন এদেশে

আসেন তখন বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি যখন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল তখন, বিশেষতঃ পাল-শাসন যুগে, বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের আবেদন ক্রমশঃ প্রশস্ততর হচ্ছিল। পালসম্রাটরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং রাজানুগ্রহপুষ্ট এই ধর্ম সহজেই জনচিত্ত আকৃষ্ট করেছিল। পালরাজবংশের পূর্ববর্তী বঙ্গ এবং সমতটের খড়্গবংশীয় রাজারাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

সপ্তম শতক থেকে বাংলা এবং পূর্ব-ভারতকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ-ধর্মের যে প্রাধান্য রচিত হয়েছিল, ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চলের ধর্মমতের সঙ্গে তার যোগাযোগ না থাকলেও এই ধর্ম ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব এবং মধ্য-এশিয়ায় দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল।

পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে বৌদ্ধধর্ম একদিকে নেপাল তিব্বত আর একদিকে সুমাত্রা যবদ্বীপে প্রসার লাভ করেছিল, তার প্রকৃতি ও স্বরূপ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে হিউয়েন সাঙ-এর সময়কার বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তার অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের গতি ও প্রকৃতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে এই ধর্মের রূপান্তর ঘটেছে। গৌতমবুদ্ধ যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন তার সঙ্গে অশোক-প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মে ব্যাপকতর পরিবর্তন ঘটেছিল। ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ যে বৌদ্ধধর্মের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার সঙ্গেও পূর্ব-প্রচারিত ধর্মের অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়।

যুগে যুগে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরের কারণ সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই কালে কালে এই ধর্মের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে বৌদ্ধ-ধর্মে যে পরিবর্তন ঘটেছিল ব্যাপকতার দিক থেকে সে পরিবর্তন

অন্যান্য যুগের পরিবর্তনকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই পরিবর্তনের ফলে ভারতবর্ষে সহজিয়া ধর্মমতের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছিল।

সহজিয়া ধর্মমতের স্বরূপ আলোচনা করার আগে বৌদ্ধধর্মে এই রূপান্তর কি করে সম্ভব হলো এবং সহজিয়া মত কি ভাবে জন-মানসে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলো, সে কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। পালরাজারা যে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন সেই ধর্মের সঙ্গে মহাযান ধর্মমতের পার্থক্য রয়েছে। পাল-রাজাদের সমর্থিত এই ধর্মকে বলা হয় মহাযান-যোগাচার বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্মের উপর তান্ত্রিক ধ্যান কল্পনার প্রভাব সুস্পষ্ট। তন্ত্রের প্রভাবে দশম শতক থেকে বৌদ্ধধর্মে গুহ্য সাধন-তত্ত্ব, নীতি-পদ্ধতি এবং পূজাচারের প্রসার দেখা দিয়েছিল। এই পরিবর্তনের বীজ মহাযানের মধ্যে সুপ্ত থাকা বিচিত্র নয়। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ধর্মের আঙ্গিক পরিবর্তন হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। নতুন কোনও মানবগোষ্ঠী যখন কোনও একটি সমাজে প্রবেশ লাভ করে তখন সেই সমাজ আশ্রিত ধর্মের পরিবর্তন ঘটে—ইতিহাস এ তথ্য স্বীকার করে। বাংলার সমাজ জীবনে নতুন জনগোষ্ঠী প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল এবং তাদের আচরিত রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা অনুসারে তৎকালীন যুগের ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভাবিত হয়েছিল—এরূপ অনুমান করার কারণ রয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আচার্য অসঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে পর্বত-কান্তারবাসী বৃহৎ কৌম সমাজকে আকর্ষণ করবার জন্য তিনি ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, যোগিনী-ডাকিনী, পিশাচ এবং মাতৃকা তন্ত্রের নানা দেবীকে মহাযান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এ ঐতিহ্য যদি নির্ভরযোগ্য হয় তা হলে মহাযান ধর্মের, সহজিয়া ধর্মে রূপান্তর লাভের পিছনে কৌম সমাজের অনেকখানি প্রভাব ছিল। কৌম সমাজের নরনারী যাদুশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। সহজিয়া ধর্মের বহুতর আচার অনুষ্ঠান যাদুশক্তির প্রতি বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়।

বাংলা দেশের ধর্মজীবনের রূপান্তর আলোচনা প্রসঙ্গে আরো একটি কথা স্বভাবতঃ মনে হয়—অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রূপান্তরের এই গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। হয়ত এটি সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা নয়, এই সময়ে বাংলা দেশের সঙ্গে তিব্বত, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া এই যুগে গাঙ্গেয় প্রদেশের সঙ্গে পর্বত-কান্তারময় হিমালয়-ক্রোড়ে অবস্থিত এ সব অঞ্চলের রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয়েছিল ; উভয় অঞ্চলের মধ্যে সামরিক অভিযানের বিনিময় হয়েছিল—এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সামরিক অভিযান কেন্দ্র করে ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে পূর্ব-ভারতীয় জনসমাজের পরিচয়ের গণ্ডি ব্যাপকতর হয়েছিল। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে উভয় অঞ্চলের অধিবাসীদের ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি পরস্পরের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্মে এবং বিশেষ করে সহজিয়া ধর্মে যে সব বিধি-বিধানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গে তিব্বত ভুটানে প্রচলিত রীতিনীতির বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। পালরাজারা তন্ত্র-প্রভাবিত বৌদ্ধধর্ম নেপাল তিব্বতে প্রচার করেছিলেন এবং সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মকর্ম এবং দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এ কথা সর্বজনস্বীকৃত কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমরা ভারতীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার তিব্বতীয় ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করি, তা হলে সহজিয়া ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে হয়তো অনেকখানি আলোকপাত হবে।

বৌদ্ধধর্মের প্রচারকাল থেকে সুরু করে পরবর্তী দেড় হাজার বছরের মধ্যে বিভিন্ন যুগে এই ধর্মের নানা রকম পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু অষ্টম শতকের পরে বৌদ্ধধর্মের ধারায় যে পরিবর্তন আত্ম-প্রকাশ করেছিল, পূর্ববর্তী যুগের পরিবর্তনের তুলনায় তার গুরুত্ব অনেক বেশী। এই পরিবর্তনের ধারা বৌদ্ধধর্মকে নতুন পথে পরিচালিত করে ক্রমশঃ তাকে একটি নতুন ধর্মমতের অঙ্গীভূত করে নেয়।

নতুন ধর্মমত সাধারণতঃ সহজিয়া ধর্ম নামে পরিচিত। এই ধর্মের প্রবর্তকদের বলা হয় সিদ্ধাচার্য। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে সম্ভবতঃ এঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁরা দেশীয় ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সব গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়নি কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তিব্বতের বৌদ্ধ আচার্যরা বাংলা ও বিহারের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সাহায্যে এই সব গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় এই সকল অনুবাদ 'তেঙ্গুর' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মূল যে ভাষায় সিদ্ধাচার্যদের গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার অধিকাংশ লোপ পেলেও তিব্বতীয় অনুবাদগ্রন্থ থেকে তাঁদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। মূল বাংলা ভাষায় যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে চর্যাপদগুলোই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। চর্যাপদ এবং তেঙ্গুর গ্রন্থে উল্লিখিত অনুবাদের সাহায্যে সহজিয়া ধর্মের কিছুটা পরিচয় লাভ করা সম্ভব।

সহজযান বা সহজিয়া ধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে এতে গুরুর স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। যাঁরা সহজযানপন্থী ছিলেন তাঁদের মতে— "ধর্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে; পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। গুরু বুদ্ধ অপেক্ষাও বড়; গুরু যাহা বলিবেন বিচার না করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিতে হইবে।"

গুরুবাদ ছাড়া সহজিয়া ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বৈদিক, পৌরাণিক, জৈন এমন কি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্লেষ এবং বিদ্রূপ বর্ষণ বিষয়ে এঁদের তৎপরতা। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতীয় জনমানসে যে সব বিশ্বাস এবং সংস্কার শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সব সংস্কার এবং বিশ্বাসের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেননি সিদ্ধাচার্যগণ। তাঁদের রচনায় এমনি তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে যা নিঃসন্দেহে পরধর্মের প্রতি নিষ্করুণ অসহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করে। বৌদ্ধ শ্রমণ, জৈন সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত সকলেই এঁদের কাছ থেকে

পেয়েছেন অবিমিশ্র শ্লেষ এবং বিদ্রূপ। এই প্রসঙ্গে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা হিন্দু দেব দেবীদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা-সূচক এবং বিদ্রূপাত্মক যে সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সিদ্ধাচার্যদের আক্রমণ পাদ্রীদের আক্রমণের তুলনায় কিছুমাত্র কম তীব্র নয়। সরহ-রচিত দোঁহাকোষ থেকে উদ্ধৃত দু'টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধাচার্যদের মনোভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। সরহ লিখেছেন—"ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা বাজায়, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিটমিট করে, কানে খুস খুস করে ও লোককে ধাঁধা দেয়।" আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—"ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়; নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল কুকুরের মুক্তি আগে হইত।"

চর্যাপদে যে সব শ্লোক স্থান লাভ করেছে তাদের অধিকাংশই অনুরূপ নেতিবাচক ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

"কিং তো দীবেঁ কি তো নিবেজ্জ
কিং তো বিজ্জই মন্তহ সেঝঁ
কিং তো তিত্থ তপোবন জাই
মোকখ্ কি লব্‌ভই পানী হ্নাই।"

কি (হইবে) তোর দীপে, কি (হইবে) তোর নৈবেদ্যে, কি করা হইবে তোর মন্ত্রের সেবায়, কি তোর (হইবে) তীর্থ তপোবনে গিয়া, জলে নাহিলেই কী মোক্ষলাভ হয়?

সিদ্ধাচার্যদের আক্রমণ থেকে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন কেহই অব্যাহতি পাননি। প্রচলিত প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মমতের বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র আঘাত হেনেছিলেন। তাঁদের রচনার পিছনে শুধু

আক্রমণাত্মক এবং নেতিবাচক মনোভাব নিহিত ছিল এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে। তাঁদের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবন দর্শনও ছিল। তাঁরা গুরুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। গুরুর বচনকেই তাঁরা প্রামাণিক বলে মনে করতেন। এঁদের সাধন-প্রণালী বহু পরিমাণে গুহ্য এবং রহস্যে আবৃত। এ সব সত্ত্বেও সহজিয়া মতবাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা কষ্টকর নয়।

প্রথমে সহজযানপন্থীরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করা পর্যন্ত মোক্ষলাভ সম্ভব নয়—এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার না করেও মোক্ষলাভ সম্ভব এ কথা তাঁরা স্বীকার করে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ, তর্ক এবং পাণ্ডিত্যের সাহায্যে সমস্যার সমাধান সম্ভব অথবা সত্যের উপলব্ধি সম্ভব এ কথা তাঁরা মানতেন না। কহ্নপাদ স্পষ্টই বলেছেন যে, যুক্তিবাদী পাণ্ডিত্য-সর্বস্ব তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। কাহ্ন আরো বলেছেন যে, বিদ্যা অথবা জ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে কখনই সারতত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আগম, বেদ, পুরাণ সম্পর্কে যাঁরা গভীর ভাবে আলোচনা করেছেন, এ সবের মর্ম উদ্ঘাটন করেছেন বলে যাঁদের অহমিকার অন্ত নেই—চর্যাপদে তাঁদের সঙ্গে শ্রীফলের চতুর্দিকে ভ্রমণরত মক্ষিকার তুলনা করা হয়েছে। যাঁরা সংসারাশ্রম ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, যাঁরা শাস্ত্রবিধিমতে সন্ন্যাসী হয়ে ভস্ম দ্বারা দেহ আবৃত রাখেন অথবা যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে ঋতু পরিবর্তন অগ্রাহ্য করে একই আসনে অবিচলিত হয়ে থাকেন, যাঁরা শরীরকে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে নানা ভাবে নিগ্রহ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান—চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে তাঁরা বৃথাই মরীচিকার পিছনে ঘুরে শক্তি নাশ করেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এঁরা দক্ষিণা-প্রাপ্তির লোভে জনসাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের উপর নানারূপ শাস্ত্রের বিধান প্রয়োগ করে থাকেন। সিদ্ধাচার্য লুইপাদের মতে ধ্যানের কোনো প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রের বিধান

পালন করেও কোনো লাভ হবে না। শাস্ত্রের বিধান দ্বারা শুধু মনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না। তীর্থ-ভ্রমণে কোনোই লাভ নেই—এ কথাও চর্যাপদে উল্লেখ করা হয়েছে। সরহের একটি দোঁহাকোষে বলা হয়েছে—"হোম করিলে মুক্তি যত না হোক ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়।" অপর একটি চর্যাপদে উল্লিখিত হয়েছে —"বড় বড় স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য, সকলেই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা হীনযান (তাঁহারা যদি শীল রক্ষা করে) তাহাদের না হয় স্বর্গই হোক, মোক্ষ হইতে পারে না। যাঁহারা মহাযান আশ্রয় করেন তাঁহাদের মোক্ষ হয় না কারণ তাঁহারা কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করেন কিন্তু তাঁহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সে সকল নতুন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়।"

জাতিভেদের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধাচার্যরা স্বীকার করতেন না। এ সম্বন্ধে সরহের লেখায় পাওয়া যায়—'ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল ; যখন হইয়াছিল তখন হইয়াছিল, এখন তো অন্যেও যেরূপে হয় ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়—তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া? যদি বলো সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক ; যদি বলো বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয় তাহারাও পড়ুক।' আর তারা পড়েও তো, ব্যাকরণের মধ্যে তো বেদের শব্দ আছে এমনি ধরনের প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বহু উক্তি সিদ্ধাচার্যগণের রচনায় পাওয়া যায়।

প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুধু সিদ্ধাচার্যদের রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমসাময়িক যুগে যে সব অপভ্রংশ জৈন দোঁহা রচিত হয়েছিল সেগুলোতেও এই আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। একাদশ শতকে মুনি রামসিংহ রচিত পাহুদ দোঁহা নামে যে দোঁহা-সংগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতেও যাগযজ্ঞ, পূজা অর্চনা সংক্রান্ত শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক ও অশ্রদ্ধাভাজন বহু উক্তি স্থান লাভ করেছে। তীর্থ-ভ্রমণে কোনো

ফল হয় না, প্রস্তর-নির্মিত দেব দেবীর উপাসনা দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব নয়, মন্ত্রতন্ত্রের পথে ইষ্টলাভ সম্ভব নয়—এমনি ধরনের বহু উক্তি এই গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী-কালে সহজিয়া মতের প্রবর্তন হয়েছিল—এই ঘটনা আকস্মিক নয়। আর্যদের উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে বাংলা দেশের জনসাধারণ আর্য-প্রভাব-পুষ্ট এবং অনার্য-প্রভাব-প্রধান দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর দীর্ঘ শতাব্দীর ব্যবধানে পাশাপাশি একসঙ্গে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ অনার্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে এবং অনার্যরা যখন ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় আর্যভাব দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে, তখন সংখ্যায় আর্যরা গরিষ্ঠতা লাভ করে কিন্তু তা সত্ত্বেও অনার্য ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে আর্য এবং অনার্য এই দু'টি স্বতন্ত্র ভাবধারা দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বাংলার সংস্কৃতির স্রোতে গতি সঞ্চার করেছিল। আর্যরা স্বভাবতঃই ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মপ্রবণ আর অনার্যরা ছিল বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মপরায়ণ। আর্যদের চিন্তাধারা থেকে অনার্য চিন্তাধারা ছিল স্বতন্ত্র। আর্যরা ছিল মনোধর্মী, অনার্যরা ছিল প্রাণধর্মী। আর্যদের কর্মধারা প্রধানতঃ চিন্তাক্ষেত্রে প্রসারিত ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে তাঁরা স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে চাইতেন। তাঁদের চিন্তার স্বকীয়তা দ্বারা জ্ঞান রাজ্যের সীমা সমৃদ্ধ এবং বিস্তৃততর হয়েছিল। অনার্যদের শক্তি ছিল কর্মপ্রধান। তারা ক্রিয়াশীল বাস্তববাদী জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিল। আর্য এবং অনার্য এই দুই জাতি যখন পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হলো, তখন আর্যদের উপাস্য দেব দেবী অনার্যদের কাছেও পূজনীয়রূপে গৃহীত হলেন। অনুরূপ ভাবে অনার্য দেব দেবীও আর্যদের উপাস্য বলে বিবেচিত হলেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আর্য এবং অনার্য একই দেবতার উপাসনা করলেও সেই উপাসনা-পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট দেব দেবীর সম্পর্কে উভয়ের ধারণার মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। শিবের পূজা আর্য

এবং অনার্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে কিন্তু আর্যদের কল্পনার শিব আর অনার্যদের কল্পনার শিব অভিন্ন নয়। আর্য-কল্পনায় শিব যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেব, অনার্য-কল্পিত শিব ভোলানাথ গঞ্জিকাসেবী হীন কর্মে রত। শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবী চণ্ডী সম্বন্ধেও আর্য এবং অনার্য কল্পনায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

একাদশ শতক পর্যন্ত আর্য এবং অনার্য প্রভাবিত এই দু'টি স্তরের অস্তিত্ব বাংলা দেশের সমাজে অনুভব করা যেত। উভয় সংস্কৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হয়েছে। সে চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হয়েছে কিন্তু বাঙ্গালীর সমাজ জীবন থেকে এই স্তর-ভেদ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিক পরিবেশে এবং উভয় ধর্মের মধ্যে যতটুকু সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব বাঙ্গালী সমাজে ততটুকু সামঞ্জস্যই করা হয়েছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত দু'টি সংস্কৃতি এবং কর্মধারা স্বাভাবিক পরিবেশে দীর্ঘকাল প্রবাহিত হতে থাকে তখন একটির দ্বারা অপরটি প্রভাবিত হয় মাত্র; একের পক্ষে অপরের বিলোপ ঘটানো সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি কোনো কারণে এই স্বাভাবিক পরিবেশের অবসান ঘটে তা হলে তার প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এবং সংস্কৃতি জীবনে অনুভূত হয়। বাহিরের কোনো শক্তি যতদিন সমাজের নিরাপত্তাবোধকে ব্যাহত না করে ততদিন সমাজ জীবন অপরিবর্তিত থাকে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কোনো সূচনা দেখা যায় না। কিন্তু এমনি অভাবনীয় কোনো বিপর্যয় যদি ঘটে যার ফলে জাতীয় সমাজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাবোধ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা হলে সমাজ জীবনে অলঙ্ঘনীয়রূপে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এমনি ধারা বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যে একাদশ শতকের শেষভাগে। তুর্কী আক্রমণ বাঙ্গালীর ইতিহাসে এক জাতিয় দুর্দৈবের আকারে দেখা দিয়েছিল। তুর্কী অভিযান বাঙ্গালী জাতির ভাবধারার স্বাতন্ত্র্য লোপ করে বাংলার সংস্কৃতিকে একটি অখণ্ড সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আর্যীকরণের ফলে

আর্য অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পরেও যে স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন ছিল, মুসলমান আক্রমণের ফলে সেই স্বাতন্ত্র্যের শেষ চিহ্ন লোপ করে জাতীয় সংস্কৃতিকে একটি সংহত ঐক্যবদ্ধ রূপদানের সার্থক প্রয়াস করা হয়েছিল।

সংস্কৃতির এই রূপায়ণে প্রাচীন বিশ্বাস, রীতিনীতি, মতবাদ বর্জন করে বাঙ্গালী সেদিন নতুন যে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল, তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সিদ্ধাচার্যদের রচনায় আর সহজিয়া ধর্মের অভ্যুত্থানে। স্বাভাবিক নিয়মে অনার্য ভাব-ধারার প্রভাব বাঙ্গালীর সমাজে এবং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনুভূত হতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তুর্কী অভিযান অনার্য প্রভাবের গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি করেছিল এ কথা অসঙ্কোচে মেনে নেওয়া যায়।

তুর্কী আক্রমণের প্রভাব আরো একটি ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়েছিল। তুর্কী আক্রমণকারীদের অভিযান পূর্ব-ভারতে প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল! মুসল-মান আক্রমণের ফলে কত বৌদ্ধ বিহার লুণ্ঠিত হয়েছিল, বুদ্ধগত-প্রাণ কত নরনারী এদের আক্রমণে গতপ্রাণ হয়েছিল, তার সংখ্যা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে জানা যায় যে, মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণদের উপরেই ইস্‌লামপন্থিগণের আক্রোশ ছিল সর্বাধিক। পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি-সাধনের নায়ক তুর্কী আক্রমণকারীদল পালরাজগণের আগ্রহাতিশয্যে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় যে ধর্ম পূর্ব-ভারতের সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করে উত্তরে নেপাল ও তিব্বত এবং দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল, সেই বৌদ্ধধর্মের ধারা দ্বাদশ শতকের প্রথমভাগ থেকে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়েছিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে বৌদ্ধধর্মের এই অবলুপ্তির মূলে ছিল আত্মধর্ম-সচেতন পর-ধর্মদ্বেষী ইস্‌লামের পতাকাবাহী দলের প্রচণ্ড আক্রমণ। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে,

দ্বাদশ শতকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অভাবনীয়রূপে হ্রাস-প্রাপ্ত হয়ে থাকলেও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব পূর্ব-ভারত থেকে সম্পূর্ণ-রূপে অবলুপ্তি লাভ করেছিল—এই মতবাদ আপেক্ষিক সত্য। গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব কাল থেকে দীর্ঘ শতাব্দীর ব্যবধানে বৌদ্ধ-ধর্মের বহু রূপান্তর ঘটেছে। তুর্কী আক্রমণের ফলেও বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতিতে আবারও রূপান্তর দেখা দিয়েছিল। রূপান্তরিত এই ধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষপুটে আশ্রয় লাভ করে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস করেছিল। সুতরাং তুর্কী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্ত হয়েছিল এ কথা সত্য বলে স্বীকৃত হলে, তুর্কী আক্রমণের ফলে রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম নব কলেবর ধারণ করেছিল এ কথা গভীরতর সত্য। দ্বাদশ শতকে ধর্মজীবনের পুনর্গঠনের ফলে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের উপাস্য বহু দেব দেবী ব্রাহ্মণ্য-তান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে স্থান লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় একটি বহুল প্রচারিত ধর্মের আত্ম-বিলোপ ঘটেছিল এ কথা অনুমান করা দুঃসাধ্য, বরং সমসাময়িক যুগের সাক্ষ্য প্রমাণাদির আলোচনায় এই কথাই প্রমাণিত হয় যে বৌদ্ধধর্ম ফল্গুধারার ন্যায় অন্তঃসলিলা হয়ে পূর্ব-ভারতের ধর্মজীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণতি লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। আর্য ও আর্যেতর, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক এবং ব্রাহ্মণ্য-তান্ত্রিক মতে উপাস্য দেব দেবী কি ভাবে এক হয়ে গিয়ে নতুন দেবতারূপে জনসমাজে স্বীকৃতি লাভ করলেন—ধর্মঠাকুরের উপাসনা তার জ্বাজ্বল্য প্রমাণ।

মধ্যযুগে বাংলা দেশে যে সহজিয়া ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল তার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন বিশেষ ভাবে জড়িত। সহজিয়া ধর্মমত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন কাল থেকে বৌদ্ধরা তন্ত্রমন্ত্রের অনুশীলন করতেন এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং মন্ত্র মুদ্রা ধারণী যোগ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সাহায্যে একদল শিষ্যকে সন্তুষ্ট রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কোনও কোনও মহলে প্রচলিত এই মতবাদ গৃহীত হয়ে থাকলেও এটি সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হতে পারেনি। তন্ত্রের উৎপত্তি কোথায় কবে হয়েছিল তা সংশয়াতীতরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয় কিন্তু তান্ত্রিক মতের উদ্ভব যে দেশেই হয়ে থাকুক না কেন এ মতবাদ ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করে একদিকে হিন্দুধর্ম অপরদিকে বৌদ্ধধর্মের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যে সকল দার্শনিক তত্ত্বের উপর মহাযান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সকল তথ্য ক্রমশঃ জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান অপরদিকে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বসমূহের জটিলতা হেতু যখন বৌদ্ধধর্মের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতকর হয়ে উঠেছিল, তখন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বৌদ্ধধর্মে যে সকল মতবাদ গৃহীত হয়েছিল তাদের একটির নাম মন্ত্রযান। মন্ত্রযান-পন্থীদের মতে মন্ত্রই বুদ্ধত্ব লাভের উপায়।

মন্ত্রযানের উদ্ভবই বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তনের একমাত্র পরিচয় নয়। এই সময়ে আরো দু'টি একটি বিষয়ে বৌদ্ধধর্মে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছিল। এ কথা সকলেই জানেন যে, বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের মধ্যপথ অনুসরণের উপদেশ দিতেন। প্রাচীনকালে ভারতীয় যোগপন্থা আত্ম-নিগ্রহ এবং কামবিলাস প্রধানতঃ এই দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথমোক্ত পন্থার উদ্দেশ্য ছিল দেহ-পীড়ন দ্বারা আত্মিক সুখলাভ। দ্বিতীয়োক্ত পন্থার উদ্দেশ্য ছিল সকল বিষয়ে সুখ বা আনন্দের অনুভূতি দ্বারা পরম সুখ উপগত হওয়া। বুদ্ধদেব এই দু'টির মধ্যবর্তী পন্থা অনুমোদন করতেন এবং এই পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ সকলকে দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মাচার্যদের অনেকেই মধ্যপন্থা পরিত্যাগ ক'রে অপর দু'টি পন্থার সমর্থক হয়ে উঠলেন। সকল বিষয়ে সুখ বা আনন্দের অনুভূতি দ্বারা পরম সুখ লাভ করা যায়, এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের জন্য যে পন্থা নির্দেশ করলেন তার সঙ্গে কামবিলাস পন্থার অনেক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

মলিন বস্ত্র পরিষ্কার করতে হলে যেমন ক্ষারাদি কতকগুলি ময়লা সামগ্রীর সাহায্য নিতে হয়, আত্মশুদ্ধি লাভ করতে হলেও কতকগুলি অশুদ্ধ অথবা অশোভন কার্য অবলম্বন করা অপরিহার্য। বৌদ্ধাচার্যদের অবলম্বিত এই মতবাদ থেকে মহাসুখবাদের উৎপত্তি হয়েছে। এই মত অনুসারে পূর্ব-প্রচারিত শূন্যতা বা নির্বিকল্প জ্ঞানের স্থলে নিরাত্মার পরিকল্পনা গৃহীত হলো। ক্রমে এই নিরাত্মাকে দেবীরূপে কল্পনা করা হলো এবং প্রচার করা হলো যে, বোধির সাহায্যে সাধক নিরাত্মার আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে, নিরাত্মাতে লীন হয়ে মহাসুখ লাভ করে। বোধি সম্পর্কেও এই সময় নতুন মতবাদ প্রচারিত হলো। সম্যক্ বা পূর্ণ জ্ঞানকেই বলা হতো বোধি। শূন্যতা এবং করুণা এই দু'টি উপাদানের সাহায্যে বোধিলাভ করা সম্ভব— প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। সকল বস্তুকে বিশুদ্ধ শূন্যরূপে জ্ঞান করা এবং সর্বজীবে করুণার ভাব অবলম্বন করা, নির্বাণ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু পরবর্তী যুগে এক শ্রেণীর বৌদ্ধধর্মাচার্যদের মধ্যে এই মত গৃহীত হয় যে, শূন্য এবং করুণা মাত্র এই দু'টি উপাদানের সাহায্যে বোধিলাভ করা সম্ভব নয়। তাঁদের মতে স্বভাবজাত শক্তি এবং ইন্দ্রিয়কে দমন না করা পর্যন্ত বোধিলাভ সম্ভব নয়। তাঁরা এ কথাও বললেন যে, ইন্দ্রিয় দমন করতে হলে আগে সেগুলোকে উদ্‌বুদ্ধ করা প্রয়োজন। সুতরাং বুদ্ধ-প্রচারিত মধ্যপন্থার প্রতি কোনও গুরুত্ব আরোপ না করে তাঁরা সুখপন্থার যে আদর্শ, সেই আদর্শ গ্রহণ করলেন। তাতে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিরাত্মার সঙ্গে বোধিচিত্তের মিলনের মধ্য দিয়ে যাঁরা মহাসুখ লাভ সম্ভব বলে মনে করতেন, তাঁরা বজ্রযানপন্থী নামে পরিচিত। মন্ত্রযানপন্থীদের মতো এঁরাও মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। এঁরা বহুতর দেব দেবীর উপাসনা করতেন এবং মন্ত্রশক্তি দ্বারা দেব দেবীর আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন।

রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত আর একটি সম্প্রদায় কাল-চক্রযানপন্থী নামে পরিচিত। এঁরাও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সাধন-বিষয়ে বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। যোগ-সাধনার দ্বারা দেহের অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবায়ু স্থির এবং সংযত করতে পারলে বোধিচিত্ত লাভ করা যায়, এই ছিল কালচক্রযানদের মূল বক্তব্য।

মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ছাড়া বৌদ্ধধর্মে আর একটি যে নতুন মতের প্রবর্তন হয়েছিল অর্থাৎ সহজযান—সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় সাধনার ধারা সহজযান দ্বারা যত অধিক মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছে অপর কোনো মতবাদই সাধারণের মনে অতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সহজ-যানপন্থীদের মতে সকলেই বুদ্ধত্বলাভের অধিকারী, সুতরাং একটি বিশেষ বুদ্ধকে অবতাররূপে গণ্য করার কোনোই সার্থকতা নেই। এই কারণে এঁরা বাহিরের বুদ্ধকে প্রাধান্য না দিয়ে দেহের মধ্যস্থিত বুদ্ধের চিন্তার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। মন্ত্র তন্ত্রে, জপ আরাধনায় এঁদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না।

সহজযানের উদ্দেশ্য সহজ অবস্থায় উন্নত হওয়া। যে অবস্থায় উন্নত হলে মায়াময় সংসারের জ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়, আত্মার ভেদাভেদ লোপ পায়, সুখ বা দুঃখে চিত্তের কোনো পরিবর্তন হয় না—সেই অবস্থার নাম সহজ অবস্থা। এই অবস্থা আয়ত্ত করতে পারলেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। সহজযানের প্রকৃতি এবং মতবাদ আলোচনা করলে দেখা যাবে, এক দিকে বৌদ্ধধর্ম আর এক দিকে মধ্যযুগের সাধনার ধারার সঙ্গে এর যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য।

সহজযানের অনুগামীদের মতে বিভিন্ন অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে সাধক এমনি এক চরম অবস্থায় উপনীত হবেন, যখন সুখবোধ ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি তাঁর অন্তরে স্থান পাবে না। বহির্জগতের কোনো কিছু সেই চরম সুখ উপলব্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে

না। এই পরম সুখ উপলব্ধি হলেই ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ পায় এবং সহজকারের উন্মেষ হয়।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে যা সহজাত তাকেই সহজ বলা চলে। হেবজ্রতন্ত্রে বলা হয়েছে যে সকল ধর্মের স্বরূপ সহজ এবং সহজ-যানের সাহায্যেই মহাসুখ অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। সহজ-যানের সাধকদের মতে এই পন্থাকে নির্ভুল ভাবে বর্ণনা করা চলে না, কারণ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে বিশিষ্ট স্তরে সহজ ভাবের বিকাশ সম্ভব হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। হেবজ্রতন্ত্রে সেজন্য বলা হয়েছে যে, কথা দিয়ে সহজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না; একমাত্র গুরুর কৃপায় এই তত্ত্ব অধিগত হওয়া যায়। কাহ্নপাদের মতে গুরুও পুরোপুরি সহজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেন না। তিল্লপাদে বলা হয়েছে যে, সহজ মর্ম অনুভূতির বিষয় —অন্তরের গভীরে এর স্থান; কথা অথবা যুক্তি দিয়ে এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করা কোনো মতেই সম্ভব নয়। সরহের দোঁহাকোষেও সহজতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুরূপ ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর মতে সহজতত্ত্বকে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে ভাবা সম্ভব নয়। সামগ্রিক ভাবেই মাত্র এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি পদ্মের দৃষ্টান্ত অবতারণা করেছেন। পদ্মের সৌন্দর্য কোথায়? ফুলের পাপড়িতে অথবা বৃন্তে, অথবা পাতায় কিংবা সুগন্ধে? কোনোটাতেই নয়, সব ক'টি জড়িয়ে পদ্মের সৌন্দর্য। তেমনি সহজ মূলতত্ত্ব কোনো একটি বিশেষ পদ্ধতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া যেখানে অভিব্যক্তির পথ অতিক্রম করে এক জায়গায় এসে মিশে গিয়েছে, সেইখানেই খুঁজতে হবে সহজ সাধনার মূলতত্ত্ব।

সহজযানের প্রকৃতি এবং শিক্ষা আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষে পূর্বাচরিত অন্যান্য ধর্মমতের সঙ্গে এটি নিঃসম্পর্কিত নয়। প্রাচীন বৈদেশিক সাহিত্যে যে ধর্মমত প্রচার করা হয়েছিল তার সঙ্গে পরবর্তী যুগে রচিত আরণ্যক এবং

উপনিষদে প্রচারিত ধর্মের বিভিন্নতা সুস্পষ্ট। আরণ্যক এবং উপনিষদে আত্মোপলব্ধির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সহজধর্মমতেও আত্মোপলব্ধির সেই প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। 'কর্মকাণ্ড অপেক্ষা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন অধিক'—উপনিষদের এই নির্দেশ সহজযানপন্থীরা স্বীকার করে নিয়েছেন। উপনিষদে যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াবহুল পূজা-পদ্ধতির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে; সহজযান মতাবলম্বীদের মতেও বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সহজযানপন্থীদের মতে তীর্থভ্রমণে কোনো ফল নেই। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে, তাতে তীর্থভ্রমণের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বেদান্তপন্থীরাও ক্রিয়াবহুল অনুষ্ঠান বর্জন করে আত্মোপলব্ধির উপর সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করার যে উপদেশ দিয়েছেন, তার সঙ্গে সহজ-যানপন্থীদের মূলতঃ কোনো বিরোধ নেই। কোনো কোনো বিষয়ে বৈষ্ণবপন্থিগণের সঙ্গেও সহজযানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণবরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের ধার ধারেন না। অতিরিক্ত মাত্রায় পড়া-শুনার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা স্বীকার করেন না এবং একমাত্র প্রেমের সাহায্যে মুক্তিলাভ সম্ভব, এ কথা তাঁরা অকপটে বিশ্বাস করেন। সহজযানপন্থীদের মহাসুখের সঙ্গে বৈষ্ণবদের প্রেমের মধ্যে দিয়ে ভগবৎ-প্রাপ্তির সম্ভাবনার যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়। যাঁরা যোগপন্থী তাঁরা দেহভঙ্গীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উপর ইষ্টলাভ নির্ভর করে—এই মতবাদে বিশ্বাসী। সহজযানের অনুগামীরাও দেহের মধ্যে চরম ধনকে পাওয়া সম্ভব, সে কথায় বিশ্বাসী। সহজ-যান মতবাদের উপর ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীর মতবাদের প্রভাব অথবা উভয় মতবাদের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় বৌদ্ধ ও জৈন মতের সঙ্গে সহজযান মতবাদের।

যুগে যুগে নানা কারণে বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করে এক সময়

বৌদ্ধধর্মজগতে মহাযানপন্থীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। তারপর ঐতিহাসিক প্রয়োজনে মহাযান ধর্মমতের যে রূপান্তর ঘটলো, তার ফলে দেখা গেল মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নূতন ধর্মমত। যে যুগে এই সকল ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছিল, সেই যুগেই সহজযান মতের আবির্ভাব ঘটেছিল। সুতরাং সহজযান মতবাদ মহাযানের রূপান্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, এ কথা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়।

সহজযানপন্থীদের চরম মোক্ষ মহারস অথবা মহাসুখ সম্ভোগ। এই মহারসই হচ্ছে সহজ অর্থাৎ যে অবস্থায় সুখে বা দুঃখে চিত্তের কোনো পরিবর্তন হয় না—বাস্তব জীবনের কোনো আঘাতেই মন চঞ্চল হয় না। মনের এই অবস্থার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে সহজপন্থীরা বলেছেন, সহজ অবস্থায় উপনীত হতে পারলে ভাব অভাব জ্ঞান লোপ পায়। পাপ-পুণ্যবোধ থাকে না। রাগ-বিরাগের অবসান হয়। তাঁরা আরো বলেছেন—"সহজ স্বভাবতঃই নির্মল, এই সহজ-জ্ঞান উৎপন্ন হলে স্বপ্ন ভূত মন ইন্দ্রিয় অর্থাৎ উপাধি সকল নষ্ট হয় —সোমরস উৎপন্ন হয়।" সহজিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো কেবল গুরুর কৃপায় সম্ভব হতে পারে। এই কারণে সহজিয়া সাধনা-পদ্ধতিতে গুরুবাদ অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। এই পদ্ধতিতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা গুরুর ভজনা করেন এবং গুরুর উপদেশ অনুসারে সর্ববিষয়ে পালিত হয়ে থাকেন। গুরুবাদ সহজিয়া ধর্মমতের প্রবর্তনের আগেও প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্মের যখন রূপান্তর ঘটেছিল, তখন থেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে গুরুবাদের মূল্য নির্বিবাদে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। সহজিয়া পন্থীদের মধ্যে প্রচলিত গুরুবাদ সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম থেকেই গৃহীত হয়েছিল। সুফী ধর্মাবলম্বীরাও গুরুবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। সম্ভবতঃ সুফী মতবাদের প্রভাবও সহজিয়া আদর্শ অনুযায়ী পরিকল্পিত গুরুবাদে অনুভূত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে গুরু-বাদে যত না প্রয়োজন ছিল, সহজিয়া ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে গুরুর

প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী। সহজিয়া সাধনমার্গে প্রবিষ্ট হবার পূর্বে সাধনেচ্ছু ব্যক্তি সেই পথ গ্রহণ করার উপযোগী কিনা, তা নির্ধারণ করবার অধিকারী গুরু। তিনি সাধকের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করে কোন্ সাধনমার্গ তাঁর উপযোগী হবে, তা স্থির করে দেবেন। শক্তির পরিমাণ অনুসারে পাঁচটি শ্রেণী বা কুলের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই কয়েকটি কুলকে বলা হতো ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। যে পাঁচটি মহাভূত বা উপকরণ নিয়ে দেহ গঠিত, সেই উপকরণের স্তরভেদে পাঁচটি কুল-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেহের প্রধান উপকরণকে বলা হতো স্কন্ধ। সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে কোন্ স্কন্ধটি কিরূপ প্রবল, তা স্থির করে তাঁর শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করেন। তারপর কোন্ সাধন-প্রণালী অনুসরণ করলে তাঁর আয়ত্তাধীন শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, সেই সাধন-প্রণালী তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য ব্যবস্থা করেন।

সহজিয়া সাধন-প্রণালী একপ্রকার যোগ। শরীরের মধ্যে বত্রিশটি নাড়ী আছে—এইসব নাড়ীর প্রত্যেকটি শক্তির ধারক। মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ প্রদেশে অবস্থান করে মহাসূক্ষ্ম স্থান। এই স্থানটিকে চতুঃষষ্টি অথবা সহস্রদল পদ্মরূপে কল্পনা করা হয়েছে। রেল লাইনে যেমন অনেকগুলো স্টেশন ও জংসন থাকে, দেহের অভ্যন্তরের নাড়ীসমূহেরও সেইরূপ বিরাম ও সংযোগ স্থল রয়েছে। রেলগাড়িকে যেমন তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হলে একটি বিশেষ পথ অনুসরণ করে পর পর কতকগুলি স্টেশন এবং জংসন পার হতে হয়, যোগের দ্বারা তেমনি আমাদের চেতনাকে কয়েকটি বিশেষ চক্র অতিক্রম করে মস্তিষ্কে অবস্থিত মহাসূক্ষ্ম স্থানে গিয়ে পৌঁছতে হয়। এই স্থানে পৌঁছতে পারলে অভীষ্ট সিদ্ধ হলো—এই কল্পনা করা হয়েছে। চেতনা-শক্তি যখন মহাসূক্ষ্ম স্থানে গিয়ে পৌঁছায়, তখনি সাধনার শেষ এবং সাধকের চরম ও পরম আনন্দ অর্থাৎ মহাসুখ লাভ সম্ভব হয়—তখন সাধকের কাছে বহির্জগত লুপ্ত হয়ে যায়—ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞান তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তখন সাধক—জগৎ—ব্রহ্মাণ্ড—সব একাকার হয়ে যায়। অদ্বৈত জ্ঞান ছাড়া আর সব-কিছু তখন শূন্যতাপ্রাপ্ত হয়।

দেহের মধ্যে সর্বশুদ্ধ ছয়টি চক্রের অবস্থান কল্পনা করা হয়েছে —এদের বলা হয় ষট্চক্র। ষট্চক্রের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে উদ্‌বুদ্ধ করা, দেহের অভ্যন্তরস্থ শক্তিস্বরূপিণী কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা। তন্ত্র গ্রন্থাদিতে এই ষট্চক্রকে ছয় মঞ্জিলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ছয়টির নাম যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা। প্রত্যেকটি কেন্দ্রকে এক-একটি পদ্মের মতো কল্পনা করা হয়েছে। পদ্মে যেমন দল থাকে, তেমনি এক-একটি কেন্দ্রের অবস্থানে দলের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। মেরুদণ্ডের উপরে অবস্থিত হু'টি নাড়ীকে অবলম্বন করে কেন্দ্রগুলির পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। ইড়া ও পিঙ্গলা নামে হু'টি নাড়ী সুষুম্না নামে আর একটি নাড়ীকে কেন্দ্র করে, মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগ থেকে উত্থিত হয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়েছে। ছয়টি কেন্দ্রই মেরুদণ্ডের উপরে অবস্থিত। সুতরাং যোগ-সাধনার ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। মূলাধার কেন্দ্র থেকে চৈতন্য ক্রমশঃ অন্যান্য কেন্দ্রে পরিচালিত হয়ে অবশেষে মস্তিষ্কে অবস্থিত মহাসূক্ষ্ম স্থানে গিয়ে লয়প্রাপ্তি হয়—তখনি সাধনা আপন অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায়। সাধনার শেষে এই অভীষ্ট স্থানে রয়েছে বহু-আকাঙ্ক্ষিত মহাসুখ, যার সান্নিধ্যে জগতের আর সব-কিছুই মায়াময় মিথ্যা এবং অতি প্রাকৃত বলে বোধ হয়। তখন কোনো আকাঙ্ক্ষাই আর অপরিতৃপ্ত থাকে না এবং সাধকের মনোবাঞ্ছা চরম পরিতৃপ্তির মধ্যে দিয়ে সার্থক পরিণতি লাভ করে। ষট্-চক্রের পরিকল্পনা কবে কোন্ সূত্রে প্রথম গৃহীত হয়েছিল, তা ঠিক বলা যায় না। অনেকের ধারণা, এটি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল কিন্তু যেখান থেকেই আমদানি করা হয়ে থাকুক না কেন, এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। আত্মশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করা এর লক্ষ্য। তান্ত্রিক

এবং বৌদ্ধরাও পরবর্তী যুগে ষট্‌চক্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তান্ত্রিক সাধকদের মতে মূলাধার চক্রে কুল-কুণ্ডলিনী বাস করেন। সাধনার উদ্দেশ্য হলো এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে এক চক্র থেকে অন্য চক্রে সঞ্চালন করা। মূলাধার চক্র থেকে এই শক্তি সঞ্চালিত হতে হতে যখন মস্তিষ্কস্থিত সহস্রদলে গিয়ে মিলিত হয়, তখনি সাধনা সিদ্ধিলাভ করে। বৈষ্ণব সাধকরাও যোগের সাহায্যে কুলকুণ্ডলিনীর মতন রাধাশক্তি কল্পনা করতেন। এই শক্তি সর্বসুখ এবং সর্বমোক্ষদায়িনী বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থেও দেহমধ্যস্থ এই শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা স্থানলাভ করেছে। বৌদ্ধমতে ষট্‌চক্রের পরিবর্তে কায়ার কল্পনা করা হয়েছে।

প্রথমে তিনটি কায়ার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছিল—পরে এই তিনটির সঙ্গে আরও একটি কায়া যোগ করা হলো—নির্মাণকায়া, ধর্মকায়া, সম্ভোগকায়া এবং সহজকায়া। দেহমধ্যস্থ এই শক্তিটিকে যোগ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে নির্মাণকায়া থেকে সহজকায়ায় সঞ্চালিত করতে পারলেই সাধনা সিদ্ধিলাভ করে, এ কথা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহে বার বার প্রচারিত হয়েছে।

ষট্‌চক্রই হোক আর কায়াতত্ত্বই হোক, এর মূলে যে বিশ্বাসটি রয়েছে, তাতে দেহের অস্তিত্বই শুধু স্বীকৃত হয়নি—দেহের প্রাধান্যও ঘোষিত হয়েছে। চর্যাপদে দেহতত্ত্ব-বিষয়ক বহু চিন্তাধারা স্থানলাভ করেছে। সরহ বলেছেন, তীর্থযাত্রার দ্বারা কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তথাকথিত পুণ্য তিথিতে গঙ্গাস্নান করলেও মুক্তি নিকটবর্তী হয় না। এ কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হয়নি ; তাই তিনি আরো বলেছেন যে, এই দেহের মধ্যে গঙ্গা-যমুনা, গঙ্গাসাগর, প্রয়াগ-বারাণসী, সূর্য-চন্দ্র, পীঠ-উপপীঠ—সব-কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে ; সুতরাং কায়া-সাধনাই হচ্ছে মুক্তিলাভের প্রধান—এমন কি একমাত্র উপায়। কায়া-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে চাই যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কুলকুণ্ডলিনীর উদ্বোধন। এই প্রক্রিয়া অধিগত করা সহজসাধ্য নয়। এর জন্য প্রয়োজন গুরুর

সাহায্য। এই কারণে বৌদ্ধ তান্ত্রিক বৈষ্ণব এবং সহজিয়া সাধন-মার্গ গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যৌগিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি মেনে চলা দরকার। কিন্তু সে সব পদ্ধতি "গুহ্যাৎ গুহ্য"—সাধারণের গোচরের বাইরে। যাঁরা যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কায়া-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মহাসুখে লীন হতে চান—তাঁদের জন্যে প্রথমেই আবশ্যক সদ্‌গুরু। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত নয়। তাঁর অস্তিত্ব কল্পনা করা গেলেও তাঁকে আমাদের প্রত্যক্ষ 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির মধ্যে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু এই পৃথিবীতেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার মধ্যে এমনি একজন মহাশক্তিমান গুরুর সন্ধান পাওয়া সম্ভব, যিনি বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতা বলে গুহ্যাৎ গুহ্য সেই তত্ত্ব শিষ্যের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে তাঁর সিদ্ধিলাভে সহায়ক হবেন।

সহজিয়া সাহিত্যে যে সব গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল, তাদের অনেক স্থলে গুরুর মহিমা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি পদাবলীর প্রথম ভাগ এই রকম—

প্রথমে বন্দিলাম গুরু   শ্রীচরণ কল্পতরু
শ্রবণে হরয়ে পাপরাশি।
শ্রবণেতে পাপসিদ্ধি   দরশনে সর্বসিদ্ধি
পরশনে কলুষবিনাশী॥
শ্রীগুরু চরণজল   ভক্ষণে অনেক ফল—
হয় মোক্ষ প্রসাদ ভোজনে।
গুরু অন্ত গুরু তন্ত্র   গুরু যে পূজার মন্ত্র
গুরুর মহিমা কেবা জানে॥
...   .
গঙ্গা আদি তীর্থস্থান   গয়া আদি পিণ্ডদান
গুরুর সমান তবু নয়।

যত দেখ সেবাশ্রম সকলি মনের ভ্রম
ভাবিলে গুরুর দেহে হয় ॥
ভণে নিখিরাম দ্বিজে না ভজিনু গুরুপদে
না জানি কি হবে পরিণামে।
আমি পাপী দুরন্ত পাপের নাইক অন্ত
এবার তরাও নিজগুণে ॥

যোগ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব এবং মূলাধার চক্র থেকে যে মহাশক্তি উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ সহস্রারে প্রবিষ্ট হলে শিল্পীর পরিণতিলাভ সম্ভব হয়—সেই মহাশক্তিকে কুলকুণ্ডলিনী রাধা প্রভৃতি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সহজিয়া মতে এই শক্তিকে চণ্ডালী বলে নামকরণ করা হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে চণ্ডালীর পরিবর্তে ডোম্বী অথবা ডোম্বিনী কথাটিও ব্যবহার করা হয়েছে। বিদ্যুৎ-এর চেয়েও চণ্ডালীর প্রভা অনেক বেশী। ধর্মচক্র থেকে উত্থিত হয়ে এই মহাশক্তি যখন সম্ভোগ-চক্রে প্রবিষ্ট হয়, তখনি সাধকের আত্মোপলব্ধি চরম সার্থকতায় পরিণত হয়। পরবর্তী যুগে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাতে চণ্ডালীকে নৈরামণি, শবরী, সহজসুন্দরী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। শবরপদ ও কাহ্নপদে এই শক্তির স্বরূপ নিয়ে বহু আলোচনা স্থানলাভ করেছে। এই শক্তি যে নামেই অভিহিত হোক না কেন—সহজিয়াদের বিশ্বাস, গুরুর কৃপা এবং সাহায্য ভিন্ন কোনো সাধকের পক্ষেই যোগক্রিয়ার সাহায্যে এই পরমাশক্তির আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব নয়। গুরু প্রথমে সাধকের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিমাপ বিচার করবেন, তারপর সেই শক্তির পরিমাপ অনুসারে তিনি সাধকের উপযোগী সাধনমার্গ নির্দিষ্ট করার অধিকারী হবেন। আধ্যাত্মিক শক্তির পরিমাণ অনুসারে পাঁচটি কুল বা শ্রেণীর কল্পনা করা হয়েছিল। এই পাঁচটি কুলের নাম ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী এবং ব্রাহ্মণী। পাঁচটি মহাভূত বা স্কন্ধ নিয়ে

দেহ গঠিত হয়ে থাকে এবং এই পাঁচটি মহাভূত বা উপকরণের উপরে পাঁচটি শ্রেণী বা কুল-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সহজিয়া ধর্মমতের প্রভাব-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতই বিশেষভাবে সহজিয়া মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব ধর্মেও সহজিয়াপন্থীদের অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ ক'রে সহজিয়া ধর্মমত বৈষ্ণব ধর্মে ক্রমশঃ অধিকতর প্রাধান্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণ নিহিত ছিল। পাল রাজগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি যতদিন অব্যাহত ছিল, ততদিন বৌদ্ধধর্ম এবং সহজিয়া ধর্ম-প্রভাবিত বৌদ্ধমতের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু পাল শাসনের অবসানে যখন পূর্ব-ভারতে সেন রাজবংশের প্রাধান্য স্থাপিত হয়, তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হতে থাকে। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের স্থলে বাংলা-বিহারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অঙ্গ হিসাবে বৈষ্ণব ধর্ম এই যুগে বহুল প্রচারলাভ করেছিল। কিন্তু ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও এ যুগের বৈষ্ণব ধর্ম সহজিয়া ধর্মের প্রভাব এড়াতে পারেনি —এই কারণেই এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা রাধার শক্তির যে পরিচয় লিপিবদ্ধ দেখতে পাই, তার সঙ্গে তন্ত্রে-বর্ণিত কুল-কুণ্ডলিনী অথবা সহজিয়া ধর্মে বর্ণিত চণ্ডালী ও ডোম্বিনী শক্তির বিশেষ পার্থক্য দেখতে পাই না।

বৌদ্ধ, তান্ত্রিক অথবা বৈষ্ণব এই তিনটি ধর্মমতই সহজিয়া মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। খুঁটিনাটি তথ্যের দিক থেকে এই তিনটি মতের মধ্যে অনিবার্যরূপেই বহু মতানৈক্য দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্যেরও অভাব নেই। প্রথমতঃ, প্রত্যেকটি ধর্মমতেই গুরুবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এদের প্রত্যেকেরই

উদ্দেশ্য আত্মোপলব্ধি। নিজেকে জানার অর্থ নিজের শরীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। এই জ্ঞানলাভ যোগক্রিয়ার সাহায্যে সম্ভব এবং শরীরের মধ্যে যে শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারলেই সাধনার পথে চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, অভীষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে এই সকল ধর্মমতে যে বর্ণনা স্থানলাভ করেছে, তা আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাদের মধ্যে মূলগত কোনো বিরোধ নেই বরং এদের চরম লক্ষ্যের স্বরূপ সম্পর্কে একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই লক্ষ্য কোনো মতে মহাসুখবাদ, কোনো মতে মহাশূন্যবাদরূপে বর্ণিত হয়েছে।

ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মসাধনার ইতিহাসে সহজধর্মের বিবর্তন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধাচার্যদের গ্রন্থে এই ধর্মমত যেভাবে প্রচারিত হয়েছে, তার প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে স্বাধীন চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধি। কিন্তু স্বাধীন সংস্কার-বিমুক্ত চিন্তাধারার প্রতিফলন যে ধর্মে দেখতে পাওয়া যায়, সেই ধর্মেই গুরুবাদ স্বীকৃত হয়েছে—এর মধ্যে খানিকটা আপাত বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সূক্ষ্ম স্বাধীন চিন্তাধারার অভিব্যক্তি, অপরদিকে নির্বিচারে গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ—এ দু'টি পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সমাবেশ ঘটেছিল সহজিয়া ধর্মমতে। কিন্তু এতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ আলোচনা করলে এমনি আপাতবিরোধী বহু মতবাদ প্রচলিত ও গৃহীত হয়েছিল বলে দেখা যাবে।

সহজধর্মের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব জনমানসে ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত সহজধর্মের কাছে বৌদ্ধধর্মের আত্ম-বিলোপ ঘটেছিল। কিন্তু চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সহজধর্ম কিছুকাল মধ্যে আপন শক্তিকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে অধঃপতনের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে চললো। তারপর গুরুবাদ ছাড়া আর একটি কারণে সহজধর্মের আবেদন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। যে যোগক্রিয়ার সাহায্যে সহজধর্মোক্ত

মহাসুখলাভের লক্ষ্য সাধকের আয়ত্তাধীন হতে পারে, সেই প্রক্রিয়া এত গোপন রহস্যে আবৃত ছিল যে, কালক্রমে গোপন পথে অবাঞ্ছনীয় নানা ক্রিয়া-পদ্ধতি তাতে প্রবর্তিত হলো। এই পরিবর্তনের ফলে সহজধর্মের আদিম রূপ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ক্রমে সহজধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার অভিন্নতা ঘুচে গেল।

সহজধর্মের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া শাক্ত ধর্মের উপরেও অনুভূত হয়েছিল। মধ্যযুগে শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মোপাসকদের মধ্যে নাথধর্মী, অবধূত প্রভৃতি যে সব ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের চিন্তাধারার উপর সহজিয়া মতবাদের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। গুরু মৎসেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'কৌল' নামে যে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তারা সহজিয়া মতবাদ অনুসরণ করে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। আরো কয়েকটি বিষয়ে এই সম্প্রদায় সহজিয়া মতবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল—এরূপ প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু একটি বিষয়ে মৎসেন্দ্রনাথের সম্প্রদায় সহজপন্থীদের অনুসরণ করেনি। সহজধর্মের অনুগামীরা জাতিভেদ-প্রথা স্বীকার করতেন না, কিন্তু মৎসেন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুচরেরা জাতিভেদ মানতেন। এই কারণেই এই সম্প্রদায়ের পক্ষে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী শাক্তদের সঙ্গে সহজে মিশে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার ফলে এঁদের ধর্মবিষয়ক স্বাতন্ত্র্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু সহজিয়া মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাঁরা জাতিভেদ-প্রথাকে অস্বীকার করেছিলেন, তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে ধর্ম এবং সমাজ জীবনে তাঁদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। মূলতঃ সহজধর্মী এইসব সম্প্রদায় থেকেই কালক্রমে নাথপন্থী, সহজিয়া, অবধূত, বাউল প্রভৃতি নামে পরিচিত ধর্মগোষ্ঠী উদ্ভূত হয়েছিল।

বাংলা দেশে প্রাচীন ও মধ্য যুগে বহুধর্মাবলম্বী নরনারীর বাস ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এমনি ধরনের বিভিন্ন ধর্মে

অনুগত নরনারী দেখা যেত; সুতরাং বাংলা দেশের ধর্মজীবনের সঙ্গে এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ধর্মজীবনের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু একটি বিষয়ে বাংলার ধর্মজীবনে বৈশিষ্ট্যের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরকে কেন্দ্র করে এই বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের এই রূপান্তর ঘটেছিল। এই রূপান্তরের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রভাব এই রূপান্তরকে কার্যকরী করে তুলেছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যখন গণচিত্ত থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়ে আসছিল, তখন বাংলা দেশের বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত না হয়ে অন্যান্য ধর্মমতের মধ্যে আপন স্বতন্ত্র সত্তা মিশিয়ে গণচিত্তে নতুন আকারে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সহজিয়া ধর্ম এবং সহজিয়া ধর্ম থেকে উদ্ভূত নাথধর্ম, অবধূত, বাউল প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। বৌদ্ধধর্ম পূর্ব-ভারতে লুপ্ত হয়েছিল, একথা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও এ মতবাদকে ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। বৌদ্ধধর্ম পূর্ব-ভারতে লোপ পায়নি—রূপান্তরিত হয়েছিল মাত্র। পরবর্তী জীবনের ধর্মস্রোতে বৌদ্ধধর্মের ধারা ফল্গুধারার মতো অন্তর্লীন হয়ে প্রবহমান হয়ে এসেছে।

সহজ এবং সহজ থেকে উদ্ভূত সকল ধর্মমতের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাদের অনেকগুলির উপর বৌদ্ধমতের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর সম্পর্কিত এই কথাটি ভুলে গেলে বাংলার লৌকিক ধর্মের স্বরূপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হবে না।

সহজ এবং সম মতাবলম্বী অন্যান্য ধর্মমতের আলোচনা-প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। ধর্মলাভে সাধারণতঃ তিনটি উপায় নির্ধারিত হয়েছে—জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম। সহজ-ধর্মমতে জ্ঞান বা কর্ম কোনোটার প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়নি। এই

ধর্মমতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে প্রেমের উপর। শুষ্ক জ্ঞানচর্চার দ্বারা প্রেমের উপলব্ধি হতে পারে না। কর্মযোগের মধ্যে প্রেমের সার্থকতা সম্ভব নয়। একমাত্র প্রেমিক-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে প্রেম সার্থকতা লাভ করতে পারে; সুতরাং সহজিয়া এবং আনুষঙ্গিক ধর্মমতে গুরুবাদ স্বীকৃত হয়েছে। প্রেমিক গুরু প্রেমের সাধনার পথে শিষ্যকে অভীষ্টের পথে চালনা করতে পারেন। তাছাড়া সহজিয়া ধর্মপথের যাঁরা পথিক, তাঁরা আপন দেহের মধ্যে পরম ইষ্টের সন্ধান পেতে পারেন বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন, দেহের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড। প্রেম এবং বিশেষ যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে কায়ার মধ্যেই মহাসুখ লাভ করা সম্ভব। সহজিয়া ধর্মের এই সকল মতবাদ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অনেকখানি প্রভাব রয়েছে। প্রথমতঃ ধরা যাক শূন্যবাদের কথা। এই শূন্যবাদ কত প্রাচীন, কোন্ সময়ে প্রথমে প্রচারিত হয়েছিল—সে সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে শূন্যবাদ ব্যাপকভাবে পরিকল্পিত ও গৃহীত হয়েছিল এ কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। বুদ্ধদেব প্রচার করেছিলেন যে জগৎব্রহ্মাণ্ড সব-কিছু অনাত্মক। "আত্মাশূন্য জীবের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ের আত্মা নাই। অথবা ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি নিরাময় চিন্তা ও বৈরাগ্যের আধার মনের মধ্যেও আত্মা নাই।" সহজিয়া এবং অনুরূপ ধর্মমতেও শূন্যবাদের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ধর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে যে সকল ভাবধারার ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল তাদের মধ্যেও বৌদ্ধধর্মে এবং বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত সহজধর্মের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় ধর্মের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যে সকল ধর্মমত প্রচলিত হয়েছিল তাদের মধ্যে স্বভাবতঃই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে যখন ধর্মমতের ক্রম-বিকাশের কথা আমরা আলোচনা করি, তখন দেখতে পাই যে স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও সব ক'টি ধর্মমতের মধ্যে

একটি মৌলিক ঐক্যভাব রয়েছে। এই ঐক্যভাব অবলম্বন করে এক ধর্মের বিশিষ্ট মত, অথবা মতসমূহ অপর ধর্মের সংক্রামিত হয়েছে। বুদ্ধদেব যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সেই ধর্মের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও পূর্বাচরিত ধর্মের সঙ্গে তাকে কোন ক্রমেই নিঃসম্পর্কিত বলা চলে না। বহু শতাব্দী পরে যখন ভারতীয় জনচিত্তে বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের আবেদন সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল ; তখনও যে সব ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল সেই সব ধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগে যে সকল ধর্মমত প্রাধান্যলাভ করেছিল, তাদের মধ্যেও এই প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল। সুতরাং মধ্যযুগীয় সাধনা ও ধর্ম একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তারূপে গৃহীত হতে পারে না। এই সকল ধর্মমত ভারতীয় নিরবচ্ছিন্ন ধর্মসাধনার একটি প্রকাশভঙ্গী মাত্র। বহুবিধ চেষ্টার তরঙ্গে ভারতীয় ধর্মসাধনার সমুদ্র আপন গতিবেগ সঞ্চার করে বহুজন ও বহু জনপদকে অভিষিক্ত করেছিল ; মধ্যযুগীয় ভারতের ধর্মসাধনা এই মহাসমুদ্রে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ মাত্র। বাংলার বাউল ধর্ম ভারতীয় ধর্ম-সমুদ্রের একটি তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষীয় ধর্মসাধনার সম্পর্কে আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—এই যুগে যে সব ধর্মমত প্রচলিত হয়েছিল, তাদের মূল উৎস ভারতীয় চিন্তাধারা, ধর্ম এবং দর্শন থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু শুধু প্রাচীন ভারতীয় ধর্মমত দ্বারা মধ্যযুগের ধর্মমত প্রভাবিত হয়েছিল এ কথা বললে ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করা হবে। উত্তরে এবং পূর্ব-ভারতে দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে যে মুসলিম প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছিল, তার গুরুত্ব কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর প্রভাব অনিবার্যরূপে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনেও অনুভূত হয়েছিল। মধ্যযুগের ধর্মমতের পিছনে যে জীবন-দর্শন নিহিত ছিল, তা বিশুদ্ধ ভারতীয় অনুভূতি প্রসূত ছিল, এ কথা বলা যায় না। অবশ্য এই সকল ধর্মমতে ভারতীয় চিন্তাধারাই প্রাধান্যলাভ করেছিল ; কিন্তু পুরোপুরি ভারতীয় মত সর্বস্ব হয়ে এসব মতবাদ প্রচারিত হয়নি। ইসলামের

সংস্পর্শ হেতু ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। ইসলাম ধর্মের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা ভারতীয় ধর্মমত প্রভাবিত হয়েছিল, তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সুফীমতবাদ। সুফীধর্মের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে দু'চারজন মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের পূর্বেই ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চলে এসেছিলেন, কিন্তু দ্বাদশ শতকের পূর্বে সুফীমতবাদের ব্যাপক প্রচলন হয়নি। সুফীমতের উদ্ভব হয়েছিল ইরাণ দেশে। তারপর ক্রমশঃ এই মতবাদ মিশর এবং মধ্য-এশিয়ায় বিস্তৃতিলাভ করেছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে মুসলমান অধ্যুষিত তেহেরাণ, মক্কা ও বোখারা প্রভৃতি জনপদের প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগের মাধ্যমেই সুফীমতবাদ ভারতবর্ষে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল। তারপর মুসলমানরা যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রভু বলে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন পূর্ব-ভারতে সুফীমতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবার সুযোগ পেলো। বাংলা দেশে সুফী ধর্মাবলম্বী বহু প্রচারক আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁদের অনুগামী শিষ্যরা একাধিক ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে চিসতি, কাদিরী, আদনী, নক্সবন্দী প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়েছিলেন। যে সময়ে বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে সুফীমতবাদের প্রচলন হয়েছিল, সে সময়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিপূর্বে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরের ফলে ভারতবর্ষে সহজ ধর্মমতের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। প্রাচীন বিশ্বাস মতবাদ অন্তর্হিত হয়ে তার জায়গায় দেখা দিয়েছে নতুন মত ও পথ। হিন্দু ধর্ম এই যুগে নতুন মতের ভিত্তিতে সংস্কারপন্থী হয়ে উঠেছিল। এইভাবে সে সময়ে প্রাচীন ধর্মমত সংস্কারপন্থী হয়ে উঠেছিল। ধর্ম ক্ষেত্রে রূপান্তর ও পরিবর্তনের অধ্যায় রচিত হবার উপক্রম দেখা দিয়েছিল; সেই সময়ে ভারতীয় ধর্মসাধনার তটভূমিতে আঘাত করলো বিদেশাগত সুফীমতের তরঙ্গ। ইতিপূর্বেই ভারতীয় ধর্ম-মতের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই প্রচেষ্টা

সুফীমতের সংস্পর্শ লাভ করে সৃজনীমূলক হয়ে উঠলো। তার ফলে দ্বাদশ শতক থেকে ভারতবর্ষীয় সাধনা-পদ্ধতি ও ধর্মমতের ক্ষেত্রে আমরা সুফীমতবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখতে পাই। এই সময়ে সহজিয়া ধর্মমতে গুরুবাদের যে প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল, তার সঙ্গে সুফীমতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সহজিয়া গ্রন্থে গুরুর যে সকল শক্তি এবং মাহাত্ম্য হয়েছে, সুফীগ্রন্থে বর্ণিত মুর্শিদ বা শেক-এর সঙ্গে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। এ ছাড়া সহজ ধর্মের মতো সুফীমতেও দেহতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া উভয় ধর্মমতই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রেমের তপস্যার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দ্বাদশ শতক এবং তার পরবর্তী যুগে ভারতীয় ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে যে সব মতবাদ প্রাধান্যলাভ করেছিল, সেইসব মতবাদ আশ্রয় করে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নব নব যে সকল স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল—বাউল ধর্ম তাদের অন্যতম। সংঘর্ষ ও সমন্বয় সাধনের বহুতর স্তর অতিক্রম করে ভারতীয় সাধনা আপন অভিব্যক্তির পথে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছিল, যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত এর যাত্রাপথ—একাধারে বিরোধ ও মিলনের প্রচেষ্টা দ্বারা চিহ্নিত হয়ে উঠেছিল। বাউল ধর্ম স্বাভাবিক অভিব্যক্তির পথে ভারতীয় ধর্মসাধনার একটি সার্থক পদক্ষেপ।

বাংলা দেশে কিভাবে এবং কবে বাউল ধর্মের প্রথম প্রচলন হয়েছিল—ইতিহাস তার সন্ধান রাখে না। কিন্তু বাউল সাধনা ভারতীয় ধর্মসাধনার যে একটি অবিচ্ছেদ্য ধারা, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইসলামের সুফীমত দ্বারা বাউল ধর্ম ও সাধনা প্রভাবিত হয়েছিল এ কথা স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ভারতীয় ধর্মজীবনে যে রূপান্তর ঘটেছিল সে সম্পর্কেও প্রমাণের অভাব নেই। সহজ ধর্মমতের দ্বারা মধ্যযুগের ধর্মমত বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু বাউল ধর্মমত বিস্তৃতভাবে

আলোচনা না করা পর্যন্ত কোনো ধর্মমত দ্বারা এই মতবাদ কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নয়। এদের ধর্মমত এবং সাধন-পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে বাউল শব্দটি কি করে উৎপত্তি হলো, সেটি আলোচনা করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনান্তে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেটি উদ্‌ধৃত করছি।

"একটি বিশেষ ধর্মের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানাজনে নানামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন বাউল শব্দটি বায়ু শব্দের সহিত আছে। এই অর্থদ্যোতক ল প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন; এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগ-শাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধন করিবার সাধনা করেন, তাঁহারা বাউল। কেহ বলেন বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থ জীবনধারণ এবং তাহা সংগ্রহ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার সাধনা করেন যাঁহারা, তাঁহারা বাউল। আবার কেহ বলেন সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রকৃতরূপ বাউল। যাঁহারা বাতাধিক, তাঁহারা পাগল; যাঁহাদের আচরণ সাধারণের তুল্য নহে, লোকে তাঁহা-দিগকে পাগল বা বাতুল বলে। এরূপ সাধারণ সমাজ বহির্ভূত আচার-ব্যবহার-সম্পন্ন ধর্মসম্প্রদায়—বাউল।"

বাউলদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের পরিচয় সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁরা বলেছেন যে কেউ যদি তাঁদের বাতুল বা পাগল বলে মনে করে তাতে তাঁদের আপত্তির কোনো কারণ নেই। তাঁরা বলেন আমরা পাগল···মনে কর, যেন আমরা সামাজিক হিসাবে মরেই গেছি। তাঁদের গানে তাঁরা নিজেদের জ্যান্তে-মরা বলে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যত ধর্ম সম্প্রদায়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে নিজেদের পাগল বলে পরিচয় দিয়েছেন এমনি সম্প্রদায়ের অভাব নেই। সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল দ্বিরানা বা পাগল বলে পরিচয় দিয়ে

থাকেন। সুতরাং বাউল কথাটি যদি বাতুল, বায়ুগ্রস্ত বা পাগল থেকে হয়েথাকে তবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বাউল কথার উৎপত্তি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে সংস্কৃত 'বহুল' শব্দটি থেকে বাউল কথার উৎপত্তি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ আবার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আরবী আউলিয়া কথার সঙ্গে বাউল কথার উৎপত্তির সম্পর্ক রয়েছে। আউলিয়া কথাটি বহুবচন শব্দ। এর একবচন ওয়ালি। ওয়ালি কথার অর্থ বন্ধু বা ভক্ত। কারু কারু মতে ওয়ালি কথা থেকেই বাউল শব্দের উদ্ভব হয়েছিল।

বাউল শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে যত মতভেদই থাক না কেন, বাউলদের ধর্মমত ও সাধনা পদ্ধতি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বাউল-মতে বহু মতবাদ, বিশ্বাস এবং পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাবে—কিন্তু মতবাদের সূক্ষ্মতা ছেড়ে দিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করলে বাউল ধর্মের মধ্যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য মত নিহিত ছিল, দেখা যাবে। সর্বজনগ্রাহ্য এই মতবাদটি মনের মানুষ—এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাউল গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যখন প্রথম পরিচয় ঘটেছিল, সেই সময়কার তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলগণের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হতো। আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে মিশে গেছে। আমার মনে আছে,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

"কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ-বিদেশ বেড়াই ঘুরে।"

কথাটি নিতান্তই সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটি উপনিষদের ভাষায় শোনা গেছে। "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"—যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এ কথাটি শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায় যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছেনা যে শিশু তারই কান্নার সুর তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছে। 'অন্তর-তর যদয়মাত্মা'—উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন মনের মানুষ বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেককাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয় থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না। তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য-রচনা, তেমনি বুদ্ধির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।"

বস্তুতঃ বাউলদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলার পল্লীজীবনের গভীরে, নদীতীরে ও প্রান্তরে বহুকাল ধরে যে সঙ্গীত আপন আনন্দে উৎসারিত হয়েছিল, শিক্ষাভিমানী নাগরিক বাঙ্গালী তার কোনও সন্ধানই রাখেনি। ঋষি কবির সত্যসন্ধানী দৃষ্টি বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীতের প্রতি বিদ্বজ্জন সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে বিলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে এদের রক্ষা করেছে। এ বিষয়ে তাঁর কাছে বাঙ্গালী জাতির ঋণ অপরিশোধ্য।

রবীন্দ্রনাথ শুধু বাউল গানের ঐশ্বর্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেননি। তিনি বাউল তত্ত্বের মূল ধারাটি নিখুঁত ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যে মনের মানুষের সন্ধানে বাউল সাধক ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, সেই মনের মানুষের কথা এর আগেও ভারতীয় ধর্ম সাধকদের মনে প্রতিভাত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধর্ম সাধনা ও উপাসনা পদ্ধতির একটি

মূল ধারা মনের মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। এর সাক্ষ্য প্রাচীনতম ভারতীয় ধর্মসাহিত্যে পাওয়া যাবে।

বাউল ধর্মমতের উৎপত্তির স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য এবং পরিণতি আলোচনা করার পূর্বে একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ যে সব ধর্মমত প্রচলিত হয়, সেই সব ধর্মমতের সমর্থনে শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ভাষ্য টিকা ইত্যাদি রচিত হয়ে থাকে। সেই সব গ্রন্থ পাঠ করলে সংশ্লিষ্ট ধর্মমত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। অধিকাংশ ধর্মের ক্ষেত্রে এমনটিও দেখা যায় যে, কোনও এক মহাপুরুষ একটি বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা সেই মতবাদকে সঙ্কলিত করে জনসাধারণের মধ্যে তা প্রচার করেন। সঙ্কলিত সেই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে ক্রমে তারও ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য রচিত হয় এবং সেই ধর্মমত পল্লবিত হয়ে, সাহিত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চিরকালের জন্য মানব সমাজের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। যে-কোনো পাঠক এই সব গ্রন্থ পড়বেন, তিনি সহজেই সেই ধর্মমতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। জগতের প্রতিটি ধর্মমতকে আশ্রয় করে বৃহদায়তন ধর্ম-গ্রন্থ এবং তৎসংক্রান্ত সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এই সব ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্থ পাঠ করলে প্রধান প্রধান ধর্মমত সম্পর্কে আমরা সহজে একটি সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হতে পারি। ধর্মের সমগ্র রূপটি ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যে সহজে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাউল ধর্মের আলোচনা এমনি সুসংবদ্ধ, কোনো ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে আমরা পাই না। এই বিশিষ্ট ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি কোনো একটি ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে প্রচারিত হয়নি। সুতরাং সমগ্র ভাবে এই ধর্মমতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সহজলভ্য নয়। বাউল মতের যেটুকু পরিচয় আমরা পাই তা ছড়িয়ে রয়েছে বাউল গানে ও কবিতায়। সহজ প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে মুক্ত আকাশের নীচে একতারার ঝঙ্কারে মনের গভীর থেকে এই সঙ্গীতধারা উৎসারিত হতো। সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাণের উপলব্ধ সত্য তারা সহজভাবে

সহজ ভাষায় পরিবেশন করতেন। প্রচারধর্মী আগ্রহ তাঁদের ছিল না। সহজ ও সরল সত্যকে তাঁরা অযথা ব্যাখ্যা-ভারাক্রান্ত করে তোলার কোনো চেষ্টা করেননি। তাছাড়া এই সব ভাবধারা কোনো একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করে পরিবেশন করা হয়নি। যে সাধকের কাছে যখন যে সত্য প্রতিভাত হয়েছে, সেইটি তিনি সহজ ভঙ্গীতে সঙ্গীতের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। তার ফলে বাউলদের রচিত যে সব সঙ্গীত সংগৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেক জায়গায় পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো জায়গায় একটি ভাবের আভাষমাত্র দেওয়া হয়েছে—যেখানে বিস্তৃততর আলোচনার প্রয়োজন ছিল সেখানে সে আলোচনা যথাযথ স্থান লাভ করেনি। অনেক জায়গায় অনেকখানি ভাবের ঐশ্বর্য একটি-দু'টি কথার মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। এছাড়া আরো একটি অসুবিধা রয়েছে। বাউল গান কিছু কিছু সংগৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু মনে হয় অনেক গানই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের অকালমৃত্যু ঘটেছে। সব না হলেও অধিকাংশ গান সংগ্রহ করা যদি সম্ভব হতো, তা হলে এই ধর্মসম্প্রদায় অবলম্বন করে বিস্তৃততর, সম্পূর্ণতর একটি চিত্র রচনা করা সম্ভব হতো। এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে রাখা কর্তব্য—যে সব বাউল গান সংগৃহীত হয়েছে, তাদের সবগুলোই যিনি অথবা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে প্রথম রচনা করেছিলেন তাঁর অথবা তাঁদের কাছে থেকে পাওয়া যায়নি। স্বয়ং রচয়িতার কাছ থেকে যে সব গান সংগৃহীত হয়েছে সেই সব গানের মৌলিকত্ব সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহপরায়ণতার অবকাশ হয়তো নেই, কিন্তু এমনি অনেক গান সংগৃহীত হয়েছে যার রচয়িতার নাম জানা যায় না। পল্লী-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সে গান বিশেষ কোনো নামে চিহ্নিত না হয়েও দীর্ঘকাল ধরে জনসমাজে প্রচলিত হয়ে এসেছে। কবে কে এই সব গান রচনা করেছিলেন, ইতিহাস তার কোনো হিসাব রাখে

না। প্রথমে যেভাবে এই সব গান রচিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাদের আঙ্গিকে অথবা রচনা-বিন্যাসে কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটেনি, একথা হলপ করে বলা যায় না। পরিবর্তন না ঘটাটাই অস্বাভাবিক। কবে এবং কার প্রভাবে এই পরিবর্তন ঘটেছিল, তা-ও জানা সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—সে সমস্যা শুধু সাহিত্যিকের সমস্যা নয়, এটি ঐতিহাসিকের কাছেও সমস্যার বিষয়। কোনো একটি রচনার কাল নির্দেশ যেখানে সম্ভব নয় সেখানে রচনার ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে। কোন্ রচনাটি কোন্ কালে রচিত হয়েছিল সেটি সঠিকভাবে না জানা পর্যন্ত তার ঐতিহাসিক মূল্য তো বটেই এবং সম্ভবতঃ সাহিত্যিক মূল্যও পুরোপুরি নির্ধারিত হতে পারে না। একটি প্রচলিত বাউল গানের কথা ধরা যাক্। এটি কার রচনা জানা যায় না; সুতরাং এই গানটির ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পক্ষে বাধা রয়েছে। রচয়িতার নাম যেখানে জানা যায় না, সেটি কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কেও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া যে সব বাউল গানের রচয়িতার নাম পাওয়া যায়, সেই সব গান সেই সব রচয়িতার দ্বারা প্রকৃতই রচিত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে গানটি যিনি প্রথম রচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে পরবর্তীকালে যে ধরনে গানটি সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছিল তার সঙ্গে অনেকখানি পার্থক্য হয়ে থাকবে। শুধু বাউল গান সম্বন্ধেই এ রকম হয়েছে তা নয়, অন্যান্য লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এমনি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। লোকসঙ্গীত এবং লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক যুগ থেকে আর এক যুগে একই বিষয়বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে, এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যুগে যুগে লোকসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, রুচিবোধে তারতম্য দেখা যায় এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হয়। ভাষার দিক থেকে তো

বটেই, ভাবের দিক থেকেও অনেক সময় পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। অনেকের ধারণা যে পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে আদি রচনার ভাব ও ভাষা ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হতে থাকে ; এ ধারণা কিন্তু অভ্রান্ত বলে মনে হয় না। এতে শুধু পরিবর্তনের কথাটাই গ্রাহ্য, ক্রমাবনতির অভিযোগ এখানে অচল। ক্রমাবনতির থিয়োরি যদি মেনে নেওয়া হয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত লোকসাহিত্য নির্মূল হয়ে যাবে, অনিবার্য রূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না—কিন্তু সত্যি সত্যি তো লোকসাহিত্য নির্মূল হয়ে যায়নি। সুতরাং পরিবর্তন আর ক্রমাবনতি সমার্থবাচক বললে ভুল করা হবে। কিন্তু ক্রমাবনতি না হলেও পরিবর্তন তো চলছে। এই কারণে আমরা যে গানটি যে অবস্থায় পেয়েছি, প্রথম যখন যেটি রচিত হয়েছিল তখন সেটি ঠিক এইভাবে রচিত হয়েছিল কিনা সেটি হলপ করে বলার উপায় নেই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেই রচনা পরিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন,—একটি গান যেখানে শুধু একটি মাত্র লোকের রচনা সেখানে তার মূল্য সীমাবদ্ধ ; কিন্তু যেখানে কোনো একটি লোকের রচনা লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে, সেখানে তার মূল্য ব্যক্তি অতিক্রম করে সমষ্টির সীমায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই হিসাবে তার মূল্যও ব্যক্তিবিশেষের রচনার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। সেটি তখন কোনো ব্যক্তির রচনা নয় —সেটি তখন সমষ্টির, সমাজের সম্পত্তি। প্রথম যখন এটি রচিত হয়েছিল তখন যে আকারে, যে ভাষায় এটি লেখা হয়েছিল এবং যখন এটি সমষ্টির সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ালো তখন সে ভাষা, সে আকার বদলে গেল। কিন্তু তাতে তার সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য কমে যায় না বরং বেড়েই যায়। ব্যক্তিবিশেষ কোনো একটি বিশেষ ভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাব্য বা সঙ্গীত রচনা করে থাকেন ; তাতে প্রতিফলিত হয় তাঁর মনের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতি। কিন্তু কোনো একটি রচনা যখন লোকসাহিত্য অথবা

লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন সমগ্রভাবে তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় সামাজিক জীবনের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন। যে পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে ব্যক্তিগত রচনা সমাজ বা কমিউনিটির সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়—সে পরিবর্তন অনিবার্য না হলেও বাঞ্ছনীয়। বাউল গান লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত এবং এখানেই এই গানের সার্থকতা। এদের রচয়িতা অথবা রচনা কাল সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা না গেলেও তাতে এদের ঐতিহাসিক মর্যাদা হানি হয় না। বরং ক্রমপরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে যখন একটি বিশেষ গান লোকসঙ্গীত অথবা লোকসাহিত্যে স্থান লাভ করে তখন তার ভিতর পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সজীবতার চিহ্ন। যে সঙ্গীত লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তার মূল্য লেখকের দৃষ্টি-ভঙ্গী অথবা রচনাবিন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সে সঙ্গীত রচয়িতারও নয়, সেটি যে কালে রচিত এবং প্রচলিত হয়েছিল সঙ্গীতটি সেই কালের সম্পত্তি হয়ে রইলো। প্রথম যিনি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তিনি যে ভাব ও ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন কালক্রমে হয়তো তা অনেকখানি পরিবর্তিত হলো। তার দেহ কালধর্মের চিহ্নে চিহ্নিত হলো। সুতরাং লোকসঙ্গীত অথবা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত রচনার মূল্য রচনাকারীর সাহিত্যিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কোনো একটি বিশেষ সময়ের পরিধির মধ্যে তার আবেদন নিঃশেষিত হয়ে যায় না। সমসাময়িক কালের পরিধি উত্তীর্ণ হয়ে সেটি মহাকালের সম্পত্তিরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। বাউল সঙ্গীতের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন। কে বা কারা কোনো একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন সে প্রশ্ন হয়তো অর্থহীন নয়, কিন্তু এ প্রশ্নের যদি সঠিক উত্তরদান সম্ভব না-ও হয়, তা হলেও সেইজন্য তার ঐতিহাসিক মূল্যের হ্রাস হয় না। কে বা কারা রচনা করেছিলেন এ প্রশ্নের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত ভাবধারা কি ইঙ্গিত বহন করে সেই প্রশ্নই অধিক প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

সন-তারিখের হিসাব হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু সন-তারিখকে অস্বীকার করাও যায় না। বাউল গান নামে পরিচিত যে সব গান আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলো খুব প্রাচীন নয় —বেশীর ভাগই অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের রচনা। কিন্তু বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এর অনেক আগে হয়েছিল। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লেখা আছে—

"বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কামে নাইক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা করিয়াছে বাউল॥"

চৈতন্যচরিতামৃত ষোড়শ শতকে রচিত হয়েছিল; সুতরাং বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অন্ততঃ ষোড়শ শতক থেকেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু ষোড়শ শতকে রচিত বাউলের কোনো রচনা পাওয়া যায়নি। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে যে সব বাউল সঙ্গীত রচিত হয়েছিল, অনুমান করা যেতে পারে যে তারও আগে থেকে এমনি ভাবধারা এবং সঙ্গীত প্রচলিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তীকালে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে বিশেষ ভাবে বাউল রচিত কোনো সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না বলেই এই ধরনের সাহিত্য রচিত হয়নি, একথা মনে করা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সম্ভবতঃ 'বাউল' কথাটি ষোড়শ শতকে একটি বিশেষ সম্প্রদায় বোঝাতে ব্যবহৃত হতো না। বাউলরা কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, এখনও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাউল সাধককে দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে যে সব দোঁহা পদাবলী কাব্য রচিত হয়েছিল—ভাবের দিক থেকে তাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত বাউল ভাবধারার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এরূপ মনে করা যেতে পারে যে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে সাহিত্যিক সাধনার মধ্যে সহজে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে এমনি সব ভাবধারা—যার সঙ্গে

পরবর্তীকালের বাউল প্রচারিত ভাবধারার সঙ্গে বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রাক্ অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্যের কিছু অংশ বাউল চিহ্নিত না হয়েও বাউল প্রভাবিত, একথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে।

বাউল রচনার সাহায্যে বাউলের মতবাদ ও ভাবধারা বিচার করা প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কোনো একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার যোগসূত্র হলো সেই সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত গ্রন্থ। এই সব গ্রন্থে বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে বিস্তারিত ভাবে তাদের বক্তব্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাউলদের রচিত এমনি ধরনের কোনো ধর্মশাস্ত্র নেই—এই কারণে বাউল মতকে একটি সুসংবদ্ধ প্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়নি। এই মতবাদ ছড়িয়ে রয়েছে সহজ আনন্দের প্রেরণায় রচিত বহু বিক্ষিপ্ত সঙ্গীতের মধ্যে। দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন বাউল সাধক বিভিন্ন যুগে যে সকল সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার পূর্ণাঙ্গ রূপ আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। নাগরিক সভ্যতার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জীবনের ভারকেন্দ্র থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। নগরের কলকোলাহলের বহু দূরে নির্জন নদীতীরে অথবা গ্রামের প্রান্তরে তথাকথিত অশিক্ষিত নিরক্ষর বাউল সাধকের কণ্ঠে সহজ আনন্দে যে সঙ্গীত ধ্বনিত হতো, আমাদের প্রাণে তার আবেদন পৌঁছতো না। দীর্ঘকাল ধরে আমরা এঁদের রচনার প্রতি স্পর্ধিত উপেক্ষা প্রদর্শন করে এসেছি। তারপর একদিন যখন আমাদের মোহ ঘুচলো, নিজস্ব সংস্কৃতি আবিষ্কারের আগ্রহ যখন আমাদের মনে জাগলো তখন অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। দীর্ঘকালের অনাদরে, উপেক্ষায় অনেক রচনা লোপ পেয়ে গেছে। আগেই বলা হয়েছে বাউলদের লেখা এই সব গানের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাউলদের চিন্তাধারার সঙ্গে

পরিচয় ঘটিয়েছিলেন শিক্ষিত সমাজের। 'মানুষের ধর্মে' তিনি বাউল চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করে এর প্রতি শিক্ষিত সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অজানিত পূর্ব সম্পদের যে ভাণ্ডার তিনি উন্মুক্ত করেছিলেন, তার দ্যুতি আকৃষ্ট করেছিল রসপিপাসু তত্ত্বানুসন্ধানকারীর দৃষ্টি। তার ফলে সুরু হলো গ্রাম থেকে গ্রামে পর্যটন, বাউল সঙ্গীত সংগ্রহের প্রয়াস।

যাঁরা স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছে বাঙালীর ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পর্যটন করে বাউল গান নিঃসন্দেহে সংগ্রহ করা সময় এবং অর্থ-সাপেক্ষ ছিল কিন্তু সংগ্রহকারীদের আরো একটি প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাউল সাধকেরা প্রচারধর্মী ছিলেন না, সুতরাং তাঁরা নিজেরা যেমন আত্মপ্রচার করতে চাইতেন না, তেমনি চাইতেন না অন্য কেউ তাদের রচনা, মতবাদ নিয়ে আলোচনা করে অথবা সাধারণের মধ্যে তা প্রচার করে। বাউলেরা গোপন ভাবে তাঁদের বিশ্বাস, মতবাদ প্রচার করতে ভালবাসতেন, পরমতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়ে অথবা নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য তাঁরা অত্যুৎসাহিতার বশবর্তী হয়ে গোপনতার অন্তরাল থেকে কখনই আত্মপ্রকাশ করেননি। এই গোপনতা সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন লিখেছেন—

"আমি একজন বাউলকে তাঁহার এই গোপনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'বাবা ইহা তো সাহিত্য নয়। ইহা আমাদের অন্তরঙ্গ প্রাণবস্তু, আপন আত্মজা। যদি কেহ আমার কন্যাকে এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে, 'তাঁহাকে লইয়া আমি গৃহী হইব'—তবে সে ক্ষেত্রে আমার দেওয়াই উচিত। সেই দেওয়াতেই আমি ধন্য, তিনি ধন্য, আমার আত্মজাও ধন্য। কিন্তু কোনো লোক শুধু রসাস্বাদন সুখের জন্য যদি আমার আত্মজাকে

চাখিয়া দেখিতে চান তবে প্রার্থয়িতাও অধন্য, আমিও অধন্য আর আত্মজাও অধন্য। এই সব বাণী সাহিত্য রসের আস্বাদনের জন্য নহে। ইহা সাধনার জন্য। হয়তো ইহাতে সাহিত্য রসও আছে। কিন্তু তাহা তো মুখ্য লক্ষ্য নহে—তাই ইহা আমরা প্রচার করি না। তবে সাধনার্থী জন সাধনার জন্য চাহিলে কখনও প্রত্যাখ্যান করি না, কিন্তু দেখিয়া লই যে ইহার এই প্রার্থনা সাচ্চা কিনা।"

যে বাউলটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর মতবাদ কোনো ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ নয়। তাঁর কথায় সমগ্র বাউল সম্প্রদায়ের মনোভাব এবং বক্তব্য সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে: বাউল সাধকেরা সমগ্র অন্তর দিয়ে যে সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই সত্যকে তাঁরা প্রচারধর্মিতা বর্জন করে শুধু যারা অধিকারী তাদের মধ্যেই উপলব্ধ সত্য প্রচার করতে চাইতেন। বৃহত্তর অনধিকারী জনসমাজকে শুধু প্রচারের লোভে সেই সত্যের অংশীদার করার কোনো ইচ্ছাই তাঁদের ছিল না। প্রচারধর্মিতার প্রতি এই অবহেলার পিছনে যত আদর্শ নিষ্ঠাই প্রকাশিত হয়ে থাক না কেন—ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যন্ত কুফলপ্রসূ হয়েছে। প্রচারের অভাবে বহু রচনা লুপ্ত হয়ে গেছে, আবার গোপনতার যূপকাষ্ঠে আহুতি দিয়েছে বাউল কণ্ঠ থেকে উৎসারিত বহু সঙ্গীতধারা।

প্রচার-বিরোধী মনোভাব বাউলের কাছে সহজাত ধর্মের অঙ্গ ছিল। পুরানো পুঁথিপত্র, শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশাসনের দোহাই—কোনোটাই তাঁরা মানতে চাইতেন না। অতীতের প্রতি সকল মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন তাঁরা। তাঁদের চলার পথে পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য পিছনে তাকাবার প্রয়োজন স্বীকার করতেন না। চলমান জীবনের পারিপার্শ্বিক থেকেই তাঁরা জীবন-রস উপভোগের সকল উপকরণ সংগ্রহ করার নীতিতে আস্থাবান ছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন বাউল-পুঁথি সংগ্রহে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে লিখেছেন—"প্রাচীনের জন্য বাউলদেরও কোনো আগ্রহ নাই। এই সব সাধনার জন্য, সাহিত্যের জন্য নয়,

সাহিত্য অর্থেই পুরাতন সব সংগ্রহ। এই সংগ্রহের উৎসাহ বাউলদের নাই। বাউলেরা পুরাতনের সংগ্রহ পুঁথির চেয়ে নূতন জীবন্তকে বিশ্বাস করেন; তাই তাঁহারা শাস্ত্রাদির সংগ্রহকে মান্য করেন না। তাঁহারা বলেন, পুরাতন যে সব উৎসব গিয়াছে—এই সব শাস্ত্র তো তাহার উচ্ছিষ্ট মাত্র। আমরা কি কুকুর যে এই এঁটো চাটিব? প্রয়োজন হয় নূতন উৎসব করিব। ভগবানের কৃপায় নূতন নূতন অন্ন আসিবে। সত্য সত্যই তাঁহাদের বিশ্বাস, যতদিন বাণীর আয়োজন ততদিন জগতে নব নব বাণী আসিবে, এই বিশ্বাস হারাইয়াই মানুষ কুকুরের মত এঁটো পাত সংগ্রহ করিয়া রাখে। কুকুরেরাও পুরাতন পাতা একদিন না একদিন ছাড়ে। মানুষ আরো অধম। এঁটো পাতায় কোন্‌টা কত পুরাতন তাই দেখিয়াই তাহাদের গর্ব। বাউলের গানে আছে—"বাসি মিছা হয় না সাঁচা।"

যে সম্প্রদায়ের পুরাতন ও শাস্ত্রের প্রতি এমনি মনোভাব—সেই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁদের চিন্তাধারা—পুঁথির আকারে রক্ষা করার চেষ্টা অস্বাভাবিক। এই কারণে বাউলের রচিত বহু গান যথাযথ রক্ষিত হয়নি।

বহু গান যথাযথ রক্ষিত হয়নি তাই নয়, যে সব গান পাওয়া গেছে, তাদেরও অনেকগুলিতে রচয়িতার নাম নেই। শ্রীযুক্ত সেন রচনা সংগ্রহ কাজে বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন—গানের রচয়িতার নাম কেন নেই এ প্রশ্ন তিনি জনৈক বাউলের কাছে করেছিলেন। শ্রীযুক্ত সেনের কথায় বলছি—"আমি এক বৃদ্ধ বাউলকে জিজ্ঞাসা করলাম এরূপভাবে রচয়িতাদের কথা ভুলিয়া যাওয়া কি ভালো?"

"তিনি তখন কিছু বলিলেন না। একটু পরে খাল ও নদীর দিক দেখাইলেন। তখন ভাটা, খালের জল খুব কম। কাদায় সব নৌকা ঠেকিয়া আছে। দু' একখানা ঠেকা নাও ঠেলিয়া ঠেলিয়া নেওয়া হইতেছে। অথচ তখন পদ্মার বুক দিয়া ভরা জলে ভরা পালে নৌকা চলিয়াছে।"

"আমাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যে নদীর নাও

ভয়া পালে চলিয়াছে ইহাদের কি পথচিহ্ন কিছু আছে? আর ঐ খালের ঠেকা নাও-এর পথই কাদায় কাদায় আঁকা রহিল। ইহার কোন্‌টি সহজ ও স্বাভাবিক? আমরা সহজ পথের পথিক, আমরা এই কৃত্রিম পদচিহ্ন রাখিয়া যাওয়াকে বড় মনে করি না।" এই সব উক্তি থেকে বাউলদের প্রচারবিমুখী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের বিশ্বাস এবং আদর্শ অনুযায়ী তারা কোনও কিছু সংগ্রহ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেনি এবং এই কারণেই বাউল সাহিত্য-পদবাচ্য কোনও সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অন্যান্য যে সব ধর্মসম্প্রদায় অথবা সাধনপন্থী-দের উদ্ভব হয়েছিল তাদের মতবাদ বিভিন্ন গ্রন্থে, দোঁহায়, কবিতায় প্রচারিত হয়েছে। তার সাহায্যে সেই সব সম্প্রদায় সংক্রান্ত বিশিষ্ট সাহিত্য গড়ে উঠেছে কিন্তু বাউলের সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং বাউলধর্মীদের মতবাদ এবং সাধনপন্থা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, সেটি হলো বাউল বিষয়ক চিন্তাধারা সম্বলিত সাহিত্যের অপ্রতুলতা। যথোপযুক্ত সংখ্যায় বাউল গান রক্ষিত হয়নি এবং কি কারণে হয়নি সে সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে কোনো অসুবিধাই নেই। কিন্তু একথা কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে এর ফলে বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালী সংস্কৃতি ইতিহাসের অনেকখানি, এমন কি, অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে!

বাউল তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের উপকরণ যতই অপ্রতুল হোক না কেন, যে উপকরণ পাওয়া গেছে তার সাহায্যে বাউল-মত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। যারা এই সব সঙ্গীতের রচয়িতা, তারা অধিকাংশই অশিক্ষিত গ্রামবাসী, সভ্যতার কৃত্রিম আবহাওয়ায় তাদের মনের পরিপুষ্টি সাধিত হয়নি। জ্ঞানাভিমানী মার্জিত বুদ্ধির প্রতিফলনও দেখতে পাওয়া যায় না তাদের রচনার মধ্যে। অন্তরের গভীরে যে তত্ত্বকে তারা গভীর সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে সেই পরম তত্ত্বকে

তারা গানের ভাষায় সুরে-ছন্দে-তালে লয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে সাবলীল ভাবে প্রকাশ করে গেছেন। শিক্ষিত লোকদের দ্বারা যদি এই ধরনের সঙ্গীত রচিত হতো, তা হলে ভাষার দিক থেকে অনেকখানি পারিপাট্য থাকতো। রচনাশৈলীর দিক থেকেও উন্নতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট হয়ে উঠতো কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন দেখা দেয়, শিক্ষিত লোকেরা সত্যি কি অমনি সরল সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় রূপদান করতে পারতেন তাদের উপলব্ধি পরম সত্যকে? বহু মত কণ্টকিত জ্ঞানের অরণ্যে শিক্ষাভিমানীরা অনেক সময় দিশেহারা হয়ে পড়েন—তাদের চিন্তাধারা ও প্রকাশ ভঙ্গীতে অনিবার্য রূপে দেখা যায় জটিলতা এবং অস্বচ্ছতা। তাদের মধ্যে কেউ সন্দেহবাদী, কেউ গোঁড়া মতাবলম্বী, কেউ আবার উৎকট স্বাতন্ত্র্যবাদী। সুতরাং তাদের রচনার সাহিত্যিক মূল্য বেশী হলেও দৃষ্টিভঙ্গীর অস্পষ্টতা হেতু তাদের বক্তব্য সহজবোধ্য নয়। তাদের রচনার মধ্যে ভাবাবেগ অপেক্ষা বুদ্ধির ছাপ বেশী। অন্তর অপেক্ষা মস্তিষ্কের মূল্য তাদের কাছে অধিক। সহজ থেকে জটিলের প্রতি টান তাদের বেশী। সমষ্টির চেয়ে ব্যষ্টির প্রতি মোহ তাদের অধিক। বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্য দিতে গিয়ে শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা কোনো বিশ্বাস বা মতবাদকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করতে সঙ্কুচিত হন—সুতরাং তাঁদের ভাষা এবং চিন্তাধারা দুই-ই আড়ষ্ট এমন কি কৃত্রিম হয়ে পড়ে। কিন্তু বাউল সঙ্গীত যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের মনে তথাকথিত শিক্ষার কোনও প্রভাবই ছিল না। তাঁরা সরল বিশ্বাস এবং সহজ বুদ্ধিতে যাকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলেন তাকে দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশ করতে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হননি। যাকে তাঁরা চরম সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলেন সেই উপলব্ধির মধ্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। তাঁদের সামগ্রিক চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী, দেহ-মন সেই বিশ্বাস দ্বারা এমনি গভীর ভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল যে তাঁরা সেই উপলব্ধ সত্যকে সমগ্র অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁদের জীবনের, দেহ-মনের প্রতি রন্ধ্রে এই

অনুভূতি এমনি গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল যে, তাঁরা তাঁদের সমগ্র চৈতন্য, সত্ত্বা সেই চরম অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সুতরাং উপকরণের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও যেটুকু উপকরণ আমাদের করায়ত্ত হয়েছে, তাতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে একটি ভাবগম্ভীর বলিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ সহজ সরল অনুভূতি। এই অনুভূতির প্রেরণা আমাদের যুক্তির রাজ্য অতিক্রম করে চৈতন্যের স্তরে গিয়ে আঘাত করে। আমাদের সামগ্রিক সত্ত্বা সেই আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়ে। আমাদের দৃষ্টি বহুযুগের ব্যবধান অতিক্রম করে চলে যায় এমনি এক গভীর অনুভূতির রাজ্যে, যেখানকার চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে আমাদের মানস চক্ষে প্রতিভাত হতে থাকে। কোনো একটি বিশিষ্ট চিন্তানায়কের বুদ্ধিদীপ্ত বিচার বিশ্লেষণ পুষ্ট মস্তিষ্কের অভিব্যক্তি নয়; একটি যুগের সামগ্রিক ধ্যান-ধারণা-চিন্তা-স্বপ্ন-আদর্শ আমাদের কাছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত তাঁদের পথ সুদূরের সন্ধান এনে দেয় আমাদের চোখে। তাঁদের অপার্থিব সঙ্গীতের ধ্বনি, নৃত্যের ভঙ্গী আমাদের মানসপটে সৃষ্টি করে বিচিত্র মায়াজাল, যার যাদুস্পর্শে পুলকিত ও শিহরিত হয়ে ওঠে আমাদের সত্ত্বা। সঙ্গীতের সুর, ধ্বনি শ্রোতার মনে আবেগ চঞ্চল এমনি একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে, যার সাহায্যে শ্রোতা এক মুহূর্তে সঙ্গীতকারের ভাবধারার সঙ্গে নিজের চিন্তা যুক্ত করে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন। যুক্তির আতিশয্য যেখানে যত বেশী, বক্তব্য সেখানে তত বেশী পরিমাণে জটিল হয়ে ওঠে। বাউল সঙ্গীতে যুক্তির চেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে অনুভূতি। হৃদয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে মস্তিষ্ক, ভাবের কাছে ভাষা। সাহিত্যের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে বাউল সঙ্গীতের সাহিত্যিক মূল্য স্বীকারে অনেকেই খানিকটা উন্নাসিকতার প্রশয় দিয়ে থাকেন। হয়তো সাহিত্য-পদবাচ্য বলে সকল রচনার গণ্য হবার যোগ্যতা নেই এবং হয়তো একারণেই

বাউল সঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাবে সাহিত্যাশ্রয়ী হতে পারেনি এবং পারেনি বলেই অনেকগুলো বাউল রচনার পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের সূচনা কাল থেকেই বাংলার গীতি কাব্যের ধারা ছু'টি স্বতন্ত্র স্রোতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। একটি স্রোত আবর্তিত হয়েছে সাধন গীতি অবলম্বন করে, অন্য স্রোতধারা প্রবহমান হয়েছে পাঁচালী পদাবলী কেন্দ্র করে। এই শেষোক্ত ধারাটি সাহিত্যের আসরে চিরকাল স্বীকৃতিলাভ করে এসেছে, কিন্তু সাধন গীতি অবলম্বন করে যে স্রোতধারার উন্মেষ হয়েছিল, সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই স্রোতধারা সাহিত্যের দ্বারদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু তারপর আসরের অভ্যন্তরে গতিবেগ প্রসারিত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু সাধন গীতির সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকলেও জনমনের উপর তার প্রভাব অনিবার্যরূপে অনুভূত হয়েছিল। বহু কথার অবতরণা করে যুক্তি জালের সাহায্যে সহজ সত্যকে অনাবশ্যক ভাবে জটিল করে তোলা হয়—ধর্মনীতিসংক্রান্ত সাহিত্য এই অভিজ্ঞতা প্রায় সব দেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; কিন্তু বাউল দরবেশ প্রভৃতি মরমীয়া সাধকদের রচনার মধ্যে তত্ত্ব বা তথ্যের কোন জটিলতা দেখা যায় না। যা তাঁরা নিজেদের উপলব্ধিতে সত্য বলে জেনেছেন তা তাঁরা সহজ সরল ভাষায় সঙ্গীতের মাধ্যমে রসজ্ঞ শ্রোতার কাছে প্রচার করে গেছেন। সাহিত্যের দরবারে তাঁদের রচনা গ্রাহ্য হবে কিনা তা নিয়ে তাঁরা চিন্তা করেননি। প্রাণের আবেগে তাঁরা তাঁদের মনের ভাবকে অকপটে প্রকাশ করে গেছেন। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের রচিত বাউল-গানের যে সংগ্রহ পাওয়া গেছে ভাষার দিক থেকে, তাতে কোনো কোনো জায়গায় হয়তো বা দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ভাবের গভীরতার দিক থেকে তাদের মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। আধ্যাত্মিক রচনা হলেই তার সাহিত্যিক মূল্য থাকবে না—

এ মতবাদ অভ্রান্ত নয়। ষোড়শ থেকে সুরু করে উনবিংশ শতক পর্যন্ত আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে যে সব কাব্য অথবা সঙ্গীত কিংবা দোঁহা রচিত হয়েছিল তাদের সাহিত্যগত মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। বিশেষতঃ ভক্তিরস আশ্রয় করে যে সব সঙ্গীত অথবা কাব্য রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই সাহিত্যিক রচনা হিসেবে সার্থক। কিন্তু সব আধ্যাত্মিক রচনায় ভক্তিরসের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়নি। কোনো কোনো সাধক সম্প্রদায়ের রচনায় ভক্তি অপেক্ষা তত্ত্বমূলক আলোচনাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশী। অনেক রচনায় প্রায় সবখানি স্থান জুড়ে রয়েছে দেহতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা। আবার কোনে কোনো রচনায় এমনি ধরনের ভাষা প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে সাধারণ শ্রেণীর পাঠক অথবা শ্রোতা সেই ভাবের অর্থ উপলব্ধি করতে না পারে। ঐ সব সম্প্রদায় তাঁদের প্রচারিত ধর্মমতকে বিশিষ্ট একটি শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন; সুতরাং অনেক সময় তাঁরা ইচ্ছা করেই দুর্বোধ্য কথা ব্যবহার করেছেন। এই ধরনের রচনা মিষ্টিক পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হতে পারে।

বাউলদের রচিত গানের যে সব সংগ্রহ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে কতকগুলো মিষ্টিক পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। বাউলদের ধর্মমত দেহতত্ত্ব দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিল। দেহতত্ত্ব অবলম্বন করে আধ্যাত্মিক মহলে যে সব আলোচনা স্থান পেয়ে এসেছে তার মধ্যে অনেকখানি জটিলতার সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সে আলোচনা সহজবোধ্য নয়। তাছাড়া দেহতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সাধনার যে বিশিষ্ট মার্গ গড়ে উঠেছিল সেই মার্গের উপাসকরা তাঁদের মতবাদ অন্যান্য মার্গের সাধনপন্থীদের কাছে প্রচার করতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। বাউল মতবাদ দেহতত্ত্ব দ্বারা যেখানে প্রভাবিত হয়েছে সেখানে সেই মতবাদ সার্বজনীন চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সর্বসাধারণের বোগধম্য করে প্রচার করার

চেষ্টাও হয়নি। সুতরাং বাউল মতবাদ যে ভাবে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রচারিত করা হয়েছে তার মধ্যে জটিলতার কোনো স্থান নেই একথা বলা চলে না। কিন্তু সমগ্র বাউল সঙ্গীত-আশ্রয়ী সাহিত্যের মধ্যে জটিলতার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ। সাধারণভাবে বাউল সঙ্গীতে জটিলতা অপেক্ষা সরলতাই বেশী প্রকট।

বাউল সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা যে আলোচনা করেছি সে আলোচনা সাধারণভাবে মধ্যযুগের মরমীয়া সম্প্রদায়ের রচনা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আধ্যাত্মিক বিষয় অবলম্বন করে সহজ সরল ভাবে সাধারণের অন্তর স্পর্শ করতে পারে এমনি ধরনের রচনার দৃষ্টান্ত আর্যাবর্তের মরমীয়া সাধু ও সন্ত সম্প্রদায়ের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। কবীর, দাদু, রুই দাস, ফরিদউ-দ্-দীন এঁদের রচিত যে সব অধ্যাত্ম গীতি পাওয়া গেছে তাদের সঙ্গে বাউল সাধকদের রচনার সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্য করা যেতে পারে।

অধুনাকালে যে সব বাউল সঙ্গীত আমাদের হস্তগত হয়েছে সেগুলো খুব প্রাচীন নয়। এদের অধিকাংশই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে রচিত হয়েছিল। এই সব রচনা খুব প্রাচীন না হলেও যে সব চিন্তাধারা এই সব রচনার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল সেই চিন্তাধারার উৎপত্তিকাল ঘটেছিল মধ্যযুগে—একথা অনায়াসে বলা চলে। এর আগে বাউল সঙ্গীত রচিত হয়েছিল এ অনুমানও যুক্তিসঙ্গত। কি কারণে সে সব রচনা রক্ষিত হয়নি সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতকে বাংলা দেশে বাউল গান সংগ্রহের দিকে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এই সময় কিছু কিছু বাউল গান বঙ্গীয় প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং কয়েকটি বাউল সঙ্গীতের সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহুকাল পর্যন্ত বাংলার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি যথাযথভাবে এদিকে আকৃষ্ট হয়নি। ঊনবিংশ শতকে বাঙ্গালীর মানস চেতনায় পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শন ও সংস্কৃতি অনেকখানি

প্রভাব বিস্তার করেছিল। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী তখন পাশ্চাত্ত্য আদর্শকে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁদের চিন্তাধারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে আছন্ন হয়ে গিয়েছিল পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের আসক্তিতে। বিদেশী সংস্কার ও সংস্কৃতির অনুসরণ করতে গিয়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী সেদিন স্বদেশী সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা থেকে অনেকখানি সরে এসেছিলেন। নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কমে আসবার ফলে যে সব উপাদান আশ্রয় করে বাঙ্গালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সেই সব উপাদানের প্রতি সেদিন তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল চরম নিঃস্পৃহতা। তাই বাউল সঙ্গীত বহুকাল পর্যন্ত অনাদৃত অবস্থায় পড়েছিল।

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার হেতু আমাদের জীবনে পরিবর্তন এসেছিল—সেই সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামোতেও অনিবার্যরূপে দেখা গিয়েছিল বিরাট পরিবর্তন। প্রাক্-ব্রিটিশযুগ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবনের ভারকেন্দ্র ছিল গ্রাম। গ্রাম এবং গ্রামবাসীকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবনস্রোত আবর্তিত হতো। কিন্তু ইংরেজ আমলের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো নূতন গড়ে ওঠা সহরের দিকে। ক্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রাম ছেড়ে নগরাভিমুখী হতে লাগলেন—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সভ্যতার ধারাও গেল বদলে। কৃষি-নির্ভর জীবনে গ্রামীণ যে সভ্যতা দীর্ঘকাল ধরে প্রাধান্য ভোগ করে আসছিল তার জায়গায় দেখা গেল নগর-কেন্দ্রিক নূতন এক সভ্যতার ধারা।

নগরাভিমুখী জনসাধারণের জীবনে অনিবার্যরূপেই অনুভূত হলো নগরকেন্দ্রিক এই নূতন সভ্যতার প্রভাব; যার ফলে আমরা ক্রমশঃ গ্রাম এবং গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। ক্রমশঃ শিক্ষাভিমানী নাগরিকদের জীবনে গ্রামের

পরিবেশের প্রতি দেখা গেল উন্নাসিকতার মনোভাব। গ্রামের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় পল্লীর শান্ত সমাহিত পরিবেশে দীর্ঘকাল ধরে যে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত রচিত হয়ে আমাদের জাতীয় সম্পদের পুষ্টিসাধন করেছিল তার সঙ্গে আমরা নিঃসম্পর্কিত হয়ে পড়লাম। গ্রাম এবং নগরের মধ্যে রচিত হলো দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। নগর দুর্গে বন্দী হয়ে আমরা বৃহত্তর জীবনের স্পন্দন যে ক্ষেত্রে অনুভূত হতো তা থেকে নির্বাসিত হয়ে রইলাম।

তারপর একদিন স্বাভাবিকভাবেই আত্মবিস্মৃতির অবসানে আমাদের মনে জেগে উঠলো আত্ম-আবিষ্কৃতির প্রেরণা। স্বদেশী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমরা ক্রমশঃ শ্রদ্ধাশীল হলাম। অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তির মোহ থেকে মুক্তিলাভ করে আমরা আমাদের ভুলে যাওয়া ঐতিহ্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আমাদের সমাজে নবজাগরণের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হতে লাগলো।

উনবিংশ শতকে বাংলার ধর্মজীবনে পাশ্চাত্যের জড় বিজ্ঞানের প্রভাব মুক্ত হয়ে বাঙ্গালী প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ মন্থন করে ধর্ম-জীবনে নবজাগণের যে বন্যা প্রবাহ এনে দিয়েছিল সেটি বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে রচনা করেছে এক পরম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বাঙ্গালীর এই আত্ম-আবিষ্কৃতির প্রচেষ্টা ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। সাহিত্য শিল্প সুকুমারকলা সব কিছুই নবজাগরণের স্পর্শে সঞ্জীবিত পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম জগতের আহ্বানে বাঙ্গালী সেদিন সাড়া দিয়েছিল। তার ফলে বাঙ্গালীরও চিন্তাধারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাহনরূপে পরিচিত লাভ করেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতকের সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বাঙ্গালী জীবনদর্শন ও চিন্তাধারা সেদিন পাশ্চাত্য ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হলেও বাঙ্গালী নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অনবহিত হয়ে পড়েনি। পাশ্চাত্য

চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে একদিকে বাঙ্গালীর চিন্তা-রাজ্যের প্রসার ঘটেছিল, অপর দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জনমানসে আত্মোপলব্ধির প্রেরণাও সঞ্চারিত হয়েছিল। বাঙ্গালী সেদিন তাঁর সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিল পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত নানা উপচারে কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙ্গালী আপন সত্তার গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে আবিষ্কার করতে চেয়েছিল নিজেকে, দেশকে—তাই সেদিন দেশের ঐতিহ্যের প্রতি বাঙ্গালীর মনে দেখা দিয়েছিল অপূর্ব মমত্ববোধ। জাতীয় বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করার মহান সঙ্কল্প নিয়ে বাঙ্গালী সেদিন দেশের গণদেবতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। শিক্ষিত সমাজে এতকাল ধরে গ্রামীণ পরিবেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে ঔদাসীন্য ও উন্নাসিকতা বর্তমান ছিল তার অবসানে দেখা গেল উদার মতাবলম্বী দৃষ্টিভঙ্গী, সহিষ্ণু বিচার প্রয়োগ পদ্ধতি।

দীর্ঘকাল পূর্বে পল্লীর জীবনকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সে সংস্কৃতি তখন লুপ্তপ্রায়। এই অবলুপ্তির কারণ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু কারণ যাই হোক উনবিংশ শতকে গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা প্রায় রুদ্ধগতি হয়ে গিয়েছিল। এই শুষ্ক-প্রায় সংস্কৃতির ধারার উপর শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রয়োগ করলেন তাদের আলোক সন্ধানী দৃষ্টি। সেই ধারাস্রোতে অবগাহন করার মত গভীরতা ছিল না, কিন্তু এই পুণ্যস্রোতের সংস্পর্শ পেয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী সেদিন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অভিসিঞ্চিত করতে পেরেছিল। সেদিন তাদের মানসপটে দীর্ঘ শতাব্দীর ব্যবধান অতিক্রম করে ভেসে উঠেছিল একটি সুস্থ সবল প্রাণচঞ্চল সমাজের ছবি। দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটন মুক্ত হয়ে সেই সমাজের নরনারীর জীবনে এসেছিল অমৃতের আস্বাদ। তাঁদের কথায় চিন্তায় কাজে ঘটেছিল চরম আনন্দের প্রাচুর্যের অভিব্যক্তি। উনবিংশ শতকের বিশুষ্ক-প্রায় গ্রামীণ সংস্কৃতির স্রোতধারার অন্তরালে তারা আবিষ্কার

করেছিলেন একটি সমৃদ্ধ আনন্দ-চঞ্চল জীবনের স্রোত। তারা ভুলে যাওয়া যুগের লুপ্ত শীর্ণ জীবনস্রোত অনুসরণ করে আবিষ্কার করতে চাইলেন এর উৎসকে। ক্রমে তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে কালের আবরণ স্বচ্ছতর হয়ে এলো। তাঁরা দেখতে পেলেন বিস্মৃতপ্রায় যুগের দৃশ্যপট। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাচীন সংস্কৃতি একদা যে ভাণ্ডার রচনা করেছিল তার বৈচিত্র্য দেখে অভিভূত হলেন তাঁরা। বাংলার মাঠে প্রান্তরে, নদীতীরে, গৃহস্থের কুটীরে, চণ্ডীমণ্ডপে, ক্ষেতে, খামারে যে জীবনসঙ্গীত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাঙ্গালীর অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল সেই সঙ্গীত ধ্বনি প্রবেশ করলো শিক্ষাভিমানী সহরবাসী বাঙ্গালীর কানে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী একদিন যে প্রতিভার স্বাক্ষর অঙ্কন করে গিয়েছিল তার প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। সেদিন এই আত্ম-আবিষ্কৃতির আগ্রহে বাঙ্গালী আপন সংস্কৃতির পরিচায়ক লুপ্তপ্রায় যে সব রত্ন উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিল, তাদের মধ্যে বাউল সঙ্গীত অন্যতম।

বাঙ্গালীর আত্ম-আবিষ্কৃতি যাঁদের সাধনা ও সন্ধানের ফলে সম্ভব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথ। বাঙ্গালীর অন্তরের সমগ্র পরিচয়টি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, আরো পড়েছিল ভারত-আত্মার শাশ্বত রূপ। উপনিষদ আশ্রয় করে ভারতীয় দর্শনের যে বিরাট তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণরূপে অধিগত করেছিলেন কবিগুরু। তিনি শুধু মানুষকেই আবিষ্কার করেননি—করেছিলেন মানুষের আত্মার গভীর অর্থকে। উপনিষদের মহতী বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন তিনি অখ্যাত-নামা তথাকথিত অশিক্ষিত পল্লীকবির রচনায়। তাঁর এই উপলব্ধির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য সকল প্রাণী, বাইরে থেকে জীবিকার অর্থ খুঁজে খুঁজে। মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে কাকে অনুভব করলে

যিনি নিহিতার্থো দধাতি, যিনি তাঁকে তাঁর অন্তর্নিহিত অর্থ দিচ্ছেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ। সেই অর্থ এই যে মানুষ মহৎ, মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে সে মহৎ, তবেই প্রমাণ হবে যে সে মানুষ; প্রাণের মূল্য দিয়েও তাকে আপন ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে, কেন না তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত, তাঁকে যে অর্ঘ দিতে হবে সে অর্ঘ সকল মানুষের হয়ে, সকল কালের হয়ে আপনারই অন্তরতম বেদীতে, আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে সে বলে 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?' মানুষের দেবতা, মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে অর্থাৎ আপনাকে পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাহিরে বিক্ষিপ্ত আপনহারা মানুষের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলাম পথের ভিখারীর মুখে—

আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যেরে
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখে শুনেছিলাম—
তোরই ভিতর অতল সাগর
সেই পাগলই গেয়েছিল
মনের মধ্যে মনের মানুষ কর অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে—আবিরাবীর্ম এধি—পরম

মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ, আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।...তেমনি মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমি'র চেয়ে যে বড় আমি সেই আমি'র সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একথাটি আমি'র কর্মই বন্ধন, সকল আমি'র কর্মমুক্তি। আমাদের বাংলা দেশের বাউল বলেছে—

মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ
একবার দিব্য চক্ষু খুলে দেখতে পাবে সব ঠাঁই।

সেই মনের মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন—যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। বলেছেন: তং বিদ্যং পুরুষং বেদ—যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।"

রবীন্দ্রনাথ বাউলদের সঙ্গে, তাদের রচনা এবং সঙ্গীতের সঙ্গে যতখানি পরিচয় লাভ করেছিলেন—তার ফলে তিনি বাউল রচনার মধ্যে উপনিষদের বাণীর প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন এবং তাতে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থেও বাউল সাধনার সঙ্গে বেদ এবং উপনিষদ প্রচারিত সাধনার মতবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে যে সব বিভিন্ন ধর্মমত প্রচারিত হয়েছে তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও একটি মৌলিক ঐক্য সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়—সুতরাং বাউল মতের সঙ্গে উপনিষদের মতবাদে সাদৃশ্য থাকা কিছুমাত্র বিস্ময়ের কারণ নয়। কিন্তু বাউল গানের সামগ্রিক সংগ্রহ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বাউল সঙ্গীতের মাধ্যমে একটি মাত্র মতবাদ বা জীবনদর্শন প্রচারিত হয়নি। বাউল গানে একাধিক মতবাদের অবতারণা করা হয়েছে এবং সর্বত্র উপনিষদ প্রচারিত আদর্শ অনুসৃত হয়নি। কিন্তু হয়নি বলে বাউল সঙ্গীত অথবা বাউল সাধনার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে একথা বলা চলে

না। বাংলার ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে বাউলপন্থিগণ যে অধ্যায় সংযোজন করেছেন—দীর্ঘকালের ব্যবধান অতিক্রম করে তার গুরুত্ব আজও অনুভূত হচ্ছে।

বাউল ধর্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার আগে কোন্ কোন্ উপকরণের সমবায়ে এই ধর্ম এবং সাধন-পদ্ধতি গঠিত হয়েছিল সে কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও ধর্মমতের ক্রমিক অভিব্যক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে সুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গণচিত্তে ধর্মীয় যে সকল চিন্তাধারা প্রতিভাত হয়েছিল, মোটামুটিভাবে সে সব কথা আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশে যে সকল ধর্ম-মতের আবির্ভাব ঘটেছিল সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত—তবু বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি আপন বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। মৌর্যশাসন আমলে বাংলা দেশের সঙ্গে আর্যাবর্তের প্রথম ঘনিষ্ঠ রাজনীতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। গুপ্তশাসন কালে বাংলা ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—এর প্রভাব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল। এই সময় থেকেই বাংলা দেশে এবং বাঙ্গালীর জীবনে ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সভ্যতার প্রয়োগ ঘটেছিল। ইতিপূর্বে বাংলায় বৈদিক ধর্মের ব্যাপক প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীনতম কাল থেকে প্রাক্ গুপ্ত যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী নিয়ে বাংলা দেশের যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল তাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অথবা আর্য সংস্কৃতির প্রভাব অনুভূত হয়নি। কিন্তু গুপ্তশাসন কাল থেকে আর্যপ্রধান সংস্কৃতি বাংলার জনচিত্তে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করতে থাকে। এই সময় থেকে একাধিক বৈদিক দেবতার পূজা প্রচলিত হয়েছিল—ক্রমশঃ বৈদিক দেবদেবীর সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীরাও যুক্ত হয়ে বাঙ্গালীর ধর্মজীবনে স্থায়ী আসন লাভ করলেন। এই যুগের উপান্ত্য

দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু ও শিব। এছাড়া এই যুগ থেকে গণেশ, কার্তিক এবং সূর্য পূজার প্রচলন ঘটেছিল।

গুপ্তযুগে বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচলন বাঙ্গালীর চিন্তা ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গীতে নিঃসন্দেহে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল —কিন্তু গুপ্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্ব থেকে আর্যেতর যে সভ্যতা ও দৃষ্টিভঙ্গী বাংলার জনসাধারণের মনে আত্মপ্রকাশ করেছিল—তাকে নির্মূল করা ব্রাহ্মণ্য বৈদিক আর্যপ্রধান সংস্কৃতির পক্ষে সম্ভব হয়নি, হয়তো সে চেষ্টাও করা হয়নি—এই কারণেই খ্রীষ্টীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শতকে আমরা বাংলায় যে ধর্মমত এবং সাধন পদ্ধতির অস্তিত্ব দেখতে পাই সেটি নিছক নির্ভেজাল আর্য সংস্কৃতি নয়। আর্যপূর্ব যে সব ধ্যান ধারণা বিশ্বাস অনুভূতি জনমনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তার প্রভাব আর্য সভ্যতার প্রবর্তনের পরেও অনুভূত হতে থাকলো। এই কারণেই গুপ্ত এবং পরবর্তীযুগে বাংলা দেশে শুধু বৈদিক দেবদেবী পূজিত হতেন তা নয়—এমনি আরো অনেক দেবদেবীরও পূজা করা হতো—যারা অনার্য কৌম সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছিল। এই যুগের সাধন পদ্ধতিতেও অনার্য প্রভাব লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছাড়া আরো একটি বিশিষ্ট ধর্মমত বাঙ্গালীর জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। এই ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। সুতরাং প্রাচীন যুগে বাঙ্গালী সংস্কৃতির স্বরূপ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এই সংস্কৃতির স্রোত তিনটি স্বতন্ত্র ধারার সমবায়ে আপন গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। এদের মধ্যে প্রাচীনতম আর্যেতর আদিম অধিবাসী-দের ধর্ম, তারপর এলো ব্রাহ্মণ্য এবং তারও পরে বৌদ্ধধর্মের বন্যা। বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থান কাল আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বৌদ্ধধর্মই বাংলা দেশে প্রথম প্রচলিত হয়েছিল। মৌর্য সম্রাট অশোকের ঐকান্তিক চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রসার লাভ করেছিল; সুতরাং বাংলা দেশ বৌদ্ধধর্মের এই প্লাবন থেকে নিজেকে স্বাভাবিক কারণেই মুক্ত রাখতে পারেনি। রাজা অশোকের পর গুপ্তশাসনের আবির্ভাব কালের মধ্যে যে দীর্ঘ সময়

অতিক্রান্ত হয়েছিল সেই সময় আর্যেতর সভ্যতা এবং বৌদ্ধ চিন্তা-ধারা ও দর্শন পাশাপাশি দু'টি স্বতন্ত্র স্রোতধারা সৃষ্টি করে বাঙ্গালীর মানসিক জীবনের ক্ষেত্রকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। তারপর চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতকে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবর্ত্তন হলো তখন বাংলার সংস্কৃতি ধারা আর্যপ্রধান সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে উঠলো। কয়েকটি শতাব্দী ধরে এই তিনটি স্বতন্ত্র ধারা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছিল। আর্যেতর এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল যেমন বৈসাদৃশ্য ছিল ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ধর্মে। প্রাচীন বাংলায় জৈন ধর্মেরও প্রবর্তনও হয়েছিল। জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতই বেদ-বিরোধী ছিল এবং স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও এই দু'টি ধর্মমতের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ আর্যেতর, ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী এবং ব্রাহ্মণ্য এই তিনটি স্বতন্ত্র ধারা দীর্ঘকাল ধরে বাংলার নরনারীর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের নরনারীদের দৃষ্টিভঙ্গী আর্যেতর মতবাদ ও ঐতিহ্য দ্বারা অতখানি প্রভাবিত হয়নি। বাঙ্গালী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের কারণ এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মধ্যে সন্ধান করা যেতে পারে।

গুপ্তশাসন যুগের অবসানের পর বাংলা দেশের সঙ্গে আর্যাবর্তের রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘকালের চেষ্টায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে সংহতি গুপ্ত সম্রাটরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে সেই সংহতি বিনষ্ট হয়েছিল এবং আর্যাবর্তের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাজবংশের অধীনে স্বতন্ত্র স্বাধীন কতকগুলি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল। বাংলা দেশে গুপ্ত পরবর্তী যুগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন একাধিক রাজবংশ কিন্তু এরা কেউই সমগ্র বাংলা দেশে তাঁদের প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারেননি। একদিকে রাজনৈতিক জীবনের এই অনৈক্য এবং অপর দিকে আর্যাবর্তের অপরাপর অংশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ—এ দু'টির প্রভাব সাংস্কৃতিক জীবনে অনুভূত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন অথবা আর্য

প্রধান আর্যাবর্তের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার ফলে গুপ্ত পরবর্তী যুগের বাঙ্গালীর জনমানসে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব কিছুমাত্রায় স্তিমিত হয়ে থাকবে। গৌড়রাজ শশাঙ্কর রাজত্বকালে বাংলা দেশ আর্যাবর্তে প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যত হয়েছিল এবং এই উদ্যোগ প্রথমে অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছিল যদিও শেষ পর্যন্ত শশাঙ্কর প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। রাজনৈতিক ইতিহাসে শশাঙ্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও শশাঙ্কের রাজত্বকালের গুরুত্ব উপক্ষণীয় নয়। বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণের মতে শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধ বিদ্বেষী। বৌদ্ধদের লেখা কাহিনীতে অতিরঞ্জনের অবকাশ রয়েছে তবু এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতির প্রাধান্য স্থাপনে অভিলাষী ছিলেন।

শশাঙ্কের মৃত্যু পর বাংলা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় আত্মপ্রকাশ করেছিল তা সমসাময়িক সাহিত্যে মাৎস্যন্যায় পর্বরূপে অভিহিত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে অরাজকতা ও অত্যাচার চলার পর জনসাধারণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো এবং তাদের আগ্রহাতিশয্যে জননায়কগণ শেষ পর্যন্ত এক মহাসভায় সম্মিলিত হয়ে গোপালদেবকে রাজা বলে নির্বাচন করলেন। গোপালদেবের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষও করে বাংলা দেশের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায় যোজনার সম্ভাবনা দেখা গেল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত পালশাসন স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। দীর্ঘকালের অরাজকতা দ্বারা উৎপীড়িত বাঙ্গালী সেদিন তাঁদের নির্বাচিত রাজবংশের নেতৃত্বে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সংহতি পুনরুদ্ধারকল্পে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল। পালশাসন যুগের গুরুত্ব শুধু রাজবৃত্তের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়— সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই যুগের গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের যে চেষ্টা করেছিলেন সে চেষ্টা সফল হয়নি। বরং শশাঙ্কের পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়েছিল। পালশাসন যুগে পূর্ব-ভারতে

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। এই যুগে বৌদ্ধ ধর্মের গতি ও প্রসার সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এই যুগের বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ববর্তী যুগের এবং প্রথম প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন নয়। বাংলা দেশে অষ্টম শতক থেকে যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল তার রূপ ও প্রকৃতি আলোচনা করলে মধ্যযুগীয় বঙ্গ-সংস্কৃতি উপর অনেকখানি আলোকপাত করা হবে।

বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তনের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মহাযান ধর্মমতের আবির্ভাব বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের প্রকৃতিকে অনেকখানি পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষে মহাযান ধর্মমতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান্য স্থাপিত হয়েছিল। অষ্টম শতকে পালরাজদের ক্ষমতালাভের সময়েও বাংলা দেশে এবং পূর্ব-ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। তারপর দু'শো বছরের মধ্যে পূর্ব-ভারতের ধর্মজগতে বৌদ্ধ-ধর্মের নবতর সংস্করণ এনে দিলো এক অভাবিতপূর্ব বিরাট পরিবর্তন। বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতিতে দ্বিতীয়বার এলো পরিবর্তন। এই পরিবর্তন মহাযান ধর্ম আশ্রয় করে ইতিপূর্বে যে পরিবর্তন এসেছিল তার মতই গুরুত্বপূর্ণ।

পাল শাসন যুগে যে বৌদ্ধধর্ম পূর্ব-ভারতে এবং ভারতের বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল সে ধর্মমতের সঙ্গে পূর্ব প্রচারিত বৌদ্ধ-ধর্মের অনেকখানি পার্থক্য। ধর্ম যেমন সামাজিক পরিবেশ গঠন করে তেমনি সামাজিক পরিবেশ এবং প্রয়োজন ধর্মের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পাল যুগে ধর্মের উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। পাল রাজবংশ বাংলার জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচিত রাজবংশ। সুতরাং এঁদের ক্ষমতালাভে জনমতের জয় সূচিত হয়েছিল। এই কারণে

এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, এই যুগে জনসাধারণ রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। পালযুগে বাংলা দেশ ধর্ম সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেছিল, রাজশক্তি এবং জনমতের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব হতো না। ধর্মজগতে পালযুগে যে পরিবর্তন এসেছিল তার মূলে ছিল বৌদ্ধধর্মের আবেদনকে ব্যাপকতর করে তোলার প্রচেষ্টা। এই কার্যভার যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের আবেদন প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নরনারীদের নিয়েই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী গঠিত হয়েছিল—এই শ্রেণীভুক্ত নরনারীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে তুলতে পারলে বাংলা এবং পূর্ব-ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ অনিবার্যরূপে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রূপে পরিচিতি লাভ করবে। সুতরাং মহা উৎসাহে এদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মতবাদ প্রচার করার আয়োজন উদ্যোগ চললো। এই উদ্যোগের ফলে বহুসংখ্যক নরনারী বৌদ্ধধর্মের শরণাগত হয়েছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে এই সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য অনেকখানি মূল্য দিতে হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে নবদীক্ষিত এই সব নরনারী সমাজের যে স্তর থেকে উদ্ভূত ছিলেন তারা বৈদিক ধর্ম-শাস্ত্রে, উপনিষদে প্রচারিত মতবাদের মর্ম উপলব্ধি করতে অপারগ ছিলেন। তাছাড়া এরা দীর্ঘকাল ধরে আর্যেতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবেশে বর্ধিত হয়েছিলেন। সুতরাং এঁরা যখন বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদায়ের সদস্যভুক্ত হলেন তখন বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতিতে অবশ্যম্ভাবী রূপে এলো পরিবর্তন। এমনি ধরনের পরিবর্তনে একদিন হিন্দু ধর্মের প্রকৃতিতেও ঘটেছিল। আর্য সংস্কৃতির বাহক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন প্রাক্ আর্য অধ্যুষিত পূর্ব-ভারতে প্রচারিত হলো এবং যখন এই ধর্মমত জনসাধারণের মধ্যে গৃহীত হলো তখন প্রাক্-আর্য ধ্যান-ধারণা এই ধর্মমতে অনুপ্রবিষ্ট হলো। কালক্রমে হিন্দুধর্মের প্রকৃতিতে পরিবর্তনের চিহ্ন সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলো। প্রাক-আর্য ধ্যান ধারণা বিশ্বাস অনুভূতির সান্নিধ্য লাভ করে হিন্দুধর্মের যে নতুন

গতিপথ রচিত হলো তার প্রধান বৈশিষ্ট্য তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের উত্থান।

আর্যপূর্ব ধ্যান-ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা শুধু হিন্দুধর্মের গতি ও প্রকৃতি প্রভাবিত হয়নি—এদের প্রভাব বৌদ্ধধর্মের উপরও গভীর ভাবে অনুভূত হয়েছিল। এই পরিবর্তনের প্রভাব পালশাসন যুগে সর্বপ্রথম অনুভূত হয়েছিল। পূর্ব-ভারতে তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব এই পরিবর্তনের পরিচয় বহন করে। পালযুগে পূর্ব-ভারত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এটি প্রথম এবং প্রধান কথা নয়। এই যুগে প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে: আর্যপূর্ব সংস্কৃতির এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সংস্পর্শ লাভ করে বৌদ্ধধর্ম নতুন খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। এই সময় বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ মহাযান থেকে বজ্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিকরূপ পরিগ্রহ করে। বৌদ্ধধর্মের এ বিবর্তনে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু দেবদেবী বজ্রযান বৌদ্ধরূপে নতুন পরিচয় লাভ করলো। হিন্দু দেবদেবী শুধু বৌদ্ধ দেবদেবীদের মধ্যেই স্থান লাভ করেন নি—কোনো কোনো বৌদ্ধ দেবতাও তান্ত্রিক হিন্দু দেবতার রূপ পরিগ্রহ করেন। এই প্রসঙ্গে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিকদের মতে "অবলোকিতেশ্বর" প্রধানতঃ বিষ্ণুর রূপান্তর বলিয়া গৃহীত হইলেও ইহা সত্য যে তাঁহার মূর্তিভেদ, যথা সিংহনাদ লোকেশ্বর, নীলকণ্ঠ ইত্যাদি শিবের বিভিন্ন রূপ কল্পনা হইতে সঞ্জাত। অন্যপক্ষে নৈরাত্মা এবং বজ্রযোগিনী প্রভৃতি বজ্রযান বৌদ্ধ দেবতার হিন্দুরূপ যে কালী এবং ছিন্নমস্তা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প। এইরূপ আরো বহু নিদর্শন উপস্থাপিত করা যাইতে পারে যাহা উভয় সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ।"

হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা কবে প্রথম প্রভাবিত হয়েছিল, সে কথা নিঃসংশয়ে বলা সহজ নয়। অনেকের ধারণা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই হিন্দুধর্ম তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত

হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের উপর এর প্রভাব প্রথম কবে অনুভুত হয়েছিল তা সন্দেহাতীতরূপে বলা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে তাঁর ধর্মমতে তান্ত্রিক প্রভাব অনুভূত হয়েছিল এ মতবাদ কোনো কোনো মহলে প্রচারিত হয়ে থাকলেও এই অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। তবে বাংলা দেশে পালশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বেই তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বৌদ্ধ মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল, একথা প্রায় সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু পাল-পূর্ব যুগে তান্ত্রিক প্রভাব গৌণভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। পালশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রভাব ব্যাপকতর ও গভীরতর ভাবে অনুভূত হয়েছিল। পরমসৌগত পালসম্রাট যে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন সেই ধর্মমত বুদ্ধ প্রচারিত মতের সঙ্গে অভিন্ন নয়। এই যুগের বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক ভাবধারা গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। ইতিপূর্বে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যে সব তান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন সে সব মতবাদ প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নি। কিন্তু পাল সম্রাটরা যখন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্যত হলেন তখন তান্ত্রিক মতবাদ প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে গৃহীত হলো। নব কলেবর প্রাপ্ত এই বৌদ্ধধর্ম পূর্ব-ভারতে এবং ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে এশিয়ার দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল।

যে তান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা প্রথমে হিন্দু এবং পরে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত হয়েছিল সেই মতবাদের ইতিহাস ও প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, মন্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাস আশ্রয় করে এই মতবাদ রচিত হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যে এবং উপনিষদে যে উচ্চাঙ্গ দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব আলোচিত এবং প্রচারিত হয়েছিল সে সব তত্ত্বের গভীরতা অনুধাবন করা জনসাধারণের পক্ষে কালক্রমে কঠিন হয়ে পড়েছিল। বিশেষতঃ যখন সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ক্রমশঃ সীমিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গিয়েছিল সেই সময় থেকে উপনিষদে প্রচারিত ধর্মের আবেদন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত

হয়ে এসেছিল। বৈদিক ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার প্রতি জনচিত্তের প্রবণতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগলো, ক্রমে যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ডবহুল অনুষ্ঠান ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। ধর্ম সম্বন্ধে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। কালক্রমে এই যাগ-যজ্ঞবহুল অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে এলো; তাদের মনে দেখা দিল সহজতর, সরলতর কোনো উপায়ে আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা সম্ভব কিনা। এই প্রয়োজনানুভূতি থেকে মন্ত্রের সার্থকতা স্বীকৃত হলো। হিন্দুধর্মে নতুন যে তত্ত্ব প্রচারিত হলো তার ভিত্তি মন্ত্রের কার্যকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ সম্ভব এই মতবাদ যখন জনমতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তখন থেকেই হিন্দুধর্ম নতুন পথে শক্তি সঞ্চয় করে অগ্রসর হতে লাগলো। ক্রমে জনমতের উপর মন্ত্রের প্রভাব এত অধিকমাত্রায় কার্যকরী হয়ে উঠলো যে, বেদ-বেদান্তে প্রচারিত ধর্মের আবেদন স্তিমিত হয়ে এলো এবং উপনিষদ প্রচারিত ধর্মের আদর্শ জনচিত্ত থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

হিন্দুধর্মের উপর মন্ত্রের এই প্রভাব যে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি এনে দিয়েছিল তার ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ভারতীয় ধর্মজগতে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। মন্ত্রের প্রভাব দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যেমন সঞ্জীবিত হয়েছিল তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম মন্ত্রের সাহায্যে জনচিত্তে প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিল। তান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত বৌদ্ধ ধর্ম খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেমে দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত পূর্ব-ভারতে প্রধানতম ধর্ম বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের এবং বিশেষতঃ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা তান্ত্রিক মতবাদের প্রচার।

মন্ত্রোচ্চারণের সার্থকতা বৌদ্ধ ধর্মে কবে প্রথম স্বীকৃত হয়েছিল সে সম্পর্কে সর্ববাদীসম্মত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব

৬

নয়। সন এবং তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে, কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণের সার্থকতা কবে স্বীকৃত হয়েছিল তার চেয়েও বড় কথা কি কারণে মন্ত্রের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্মের এই রূপান্তরের জন্য প্রধানতঃ দু'টি কারণকে দায়ী করা চলে। প্রথমতঃ, মহাযান ধর্মের প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিপূজা বৌদ্ধধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হলো। মহাযান ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে বুদ্ধদেব মহামানব রূপে পূজিত হতেন—তাঁকে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতার বলে গণ্য করা হতো না—এই কারণে বহুকাল পর্যন্ত বুদ্ধের কোনো প্রতিকৃতি বা মূর্তি রচিত হয়নি কিন্তু মহাযানপন্থীরা যখন বুদ্ধদেবকে দেবত্বের মহিমায় ভূষিত করলেন তখন থেকে বুদ্ধের প্রতিকৃতি এবং মূর্তি নির্মিত হতে লাগলো। পাথর এবং পিতলের তৈরী বহু বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাযান মতের প্রাধান্য লাভের পর থেকে বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্ব এবং ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়ের উপাসনা-পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। বুদ্ধদেব যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত ছিল সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের উপর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো ঘোষণাই করেন নি। যারা সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের উপর ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে অপারগ হতেন তারা ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে আস্থা স্থাপন করে তাদের ধর্ম সম্পর্কিত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করা সহজতর বলে মনে করতেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেখানে স্বীকৃতি লাভ করেছে সেখানে মূর্তিপূজার প্রচলন স্বাভাবিক ভাবে দেখা দেয়। মূর্তি ঈশ্বরের প্রতীক। যারা ধর্মের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য আলোচনা কঠিন বিষয় বলে মনে করেন তারা এই মূর্তিপূজার মাধ্যমে অতি সহজেই তাদের ধর্মাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির সুযোগ লাভ করেন। জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁরা দার্শনিক তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ অপেক্ষা মূর্তিপূজার মাধ্যমে ধর্মাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করা সহজতর বলে মনে করেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে

এই শ্রেণীর জনসাধারণই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মে মূর্তিপূজা এবং মন্ত্রের সার্থকতা প্রচারিত এবং গৃহীত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে বুদ্ধ যখন ঈশ্বর বলে গৃহীত হলেন এবং বুদ্ধমূর্তির পূজা যখন স্বীকৃতি লাভ করলো তখন মূর্তিপূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে মন্ত্রের সার্থকতাও বৌদ্ধধর্মে অপরিহার্য রূপে স্থান লাভ করলো।

বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণকে যেমন প্রভাবিত করেছিল তেমনি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাধারাও বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতিতে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। কোনো ধর্মমতই নিছক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ব্যক্তিগত মানস ক্ষেত্রে দার্শনিক মতবাদ ধর্মীয় চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কিন্তু জনচিত্তে দার্শনিক চিন্তাধারার আবেদনের ক্ষেত্র স্বভাবতঃই স্বল্পপরিসর। সুতরাং যে ধর্মমত জনচিত্তে আপন প্রভাব স্থাপনে অভিলাষী, সে ধর্মমতে দার্শনিক চিন্তাধারা এবং জনসাধারণের সহজগ্রাহ্য বিশ্বাস ও মতামত দুই-ই স্থানলাভ করতে বাধ্য। এই কারণে একদা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে আর্যদের বিশ্বাস অনুভূতি গ্রহণ করে তাঁদের ধর্মমতকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রচার করেছিলেন —সেই কারণেই বৌদ্ধধর্মের নায়করা তাঁদের ধর্মমতকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করার জন্যে মন্ত্রকে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—এই বাক্যের মধ্যে যে ধর্মের ইঙ্গিত করা হয়েছে সে ধর্মের অধিকারীদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কিন্তু যে ধর্ম সাধারণ লোকের কাছে মোক্ষলাভের উপায়, সে ধর্মের তত্ত্ব জটিল নয়, সহজ ও সরল। দার্শনিক তত্ত্বকে তর্ক দ্বারা, বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা অন্তরের মধ্যে যারা গ্রহণ করতে পারে, তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সকল যুগ এবং সকল ধর্মের ইতিহাসই এই উক্তি সমর্থন করবে। কিন্তু ধর্ম যেখানে লৌকিক আচার মাত্র, সেখানে ধর্ম স্বভাবতঃই আচার অনুষ্ঠানবহুল। ধর্মের শরণপ্রার্থী যারা—তারা সহজ উপায়ে মোক্ষলাভের পক্ষপাতী।

মুর্তিপূজা করে অথবা মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে সহজেই ধর্ম, মোক্ষ লাভ করা সম্ভব মনে করে তাঁরা দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেন না। তাঁরা মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে ধর্মের সার্থকতা অনুসন্ধান করেন। মন্ত্রপূজায় বিশ্বাসী এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের জন্য বৌদ্ধধর্মের নায়কগণ মন্ত্রকে তাঁদের ধর্মে স্থান দিয়েছিলেন।

তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধধর্ম উভয় ধর্মমতের উপর অনুভূত হয়েছিল। এর ফলে বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধদেব যখন প্রথম তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন তখন এটিকে বেদ এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম বিরোধী একটি মতবাদ বলে গণ্য করা হতো। এর বহু শতাব্দী পরে যখন ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতেই মন্ত্রের সার্থকতা স্বীকৃত হলো তখন এ হু'টি ধর্মমত পরস্পরের নৈকট্য লাভ করলো। দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে উভয় ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য রহিত করা সম্ভব হলো না কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর লোক এই হু'টি ধর্মকে যে ভাবে গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে পার্থক্যের বিশেষ অবকাশ রইলো না।

তান্ত্রিক মতের প্রভাব শুধু মন্ত্রোচ্চারণের স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—আরো একটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। বুদ্ধদেব মহামোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ যে অর্থে নির্বাণের আদর্শ প্রচার করেছিলেন, পরবর্তী যুগের বৌদ্ধাচার্যগণ নির্বাণ কথাটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। বাসনার চরম নিবৃত্তি বুদ্ধ প্রচারিত নির্বাণের আদর্শ, কিন্তু পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ আচার্যগণ নির্বাণ এবং মহাসুখ এই হু'টিকে সমার্থজ্ঞাপক বলে গ্রহণ করলেন। ইন্দ্রিয়রোধের যে শিক্ষা ও আদর্শ বুদ্ধ প্রচার করেছিলেন তা বিস্মৃত হয়ে তার শিষ্য স্থানীয়েরা পরবর্তী যুগে নরনারীর মিলনের মাহাত্ম্য প্রচারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

তন্ত্রের প্রভাব দ্বারা বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে মতানৈক্যের অবকাশ কম কিন্তু একথা অস্বীকার করা

যায় না যে তন্ত্রমত প্রভাবিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ভারতীয় জনমানসে অতি সহজেই আধিপত্য লাভ করেছিল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পূর্ব-ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ এই ধর্মমত দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এই ধর্মমত পূর্ব-ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বহির্ভারতীয় অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল।

তান্ত্রিক প্রভাব পরিপুষ্ট বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক হিসাবে লোকশ্রুতিতে অসঙ্গের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অসঙ্গ না কি তুষিত স্বর্গে বুদ্ধমৈত্রয়ের কাছে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করেছিলেন। কোনো কোনো কাহিনীর মতে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত সর্বপ্রথম প্রচার করেছিলেন নাগার্জুন। এসব কাহিনীর মূলে হয়তো কোনো ঐতিহাসিক সত্য নেই কিন্তু অসঙ্গ রচিত 'মহাযান শূত্রালঙ্কার' নামক গ্রন্থে যে সব মতবাদের অবতারণা করা হয়েছে তাদের সঙ্গে তান্ত্রিক মতবাদের সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাছাড়া আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—অসঙ্গ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তারও আগে তান্ত্রিক মতবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে এমনি ধরনের মতবাদ একাধিক আগম গ্রন্থে প্রচারিত হয়েছিল—এমন প্রমাণের অভাব নেই। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত 'তন্ত্রালোক' নামক গ্রন্থে যে সব মতবাদ আলোচিত হয়েছে সেগুলি প্রাচীনতর নানা গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই থেকে এরূপ অনুমান হওয়া স্বাভাবিক যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেও বৌদ্ধ তান্ত্রিক অথবা তৎ অনুরূপ মতবাদের প্রচলন ছিল। তন্ত্র ধর্মের প্রভাব ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতের উপরেই অনুভূত হয়েছিল কিন্তু কোন ধর্মমতটি আগে তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা বলা যায় না। তবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম এবং তন্ত্র প্রভাবিত হিন্দুধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

তন্ত্র প্রভাবিত বৌদ্ধধর্মে শুধু মন্ত্রের মূল্যই স্বীকৃতি লাভ করে নি —ধারণীর মূল্যও স্বীকৃত হয়েছিল। যার দ্বারা কোনো কিছুকে ধরে

রাখা হয় তাকেই বলে ধারণী। আধ্যাত্মিক অর্থে গূঢ় শক্তি-সম্পন্ন যে শব্দ মানুষের ধর্ম জীবনকে ধারণ করে তাকেই বলা হয় ধারণী। বৌদ্ধধর্মে যে সব মূল সূত্র প্রচার করা হয়েছিল সেগুলো ছিল দীর্ঘ এবং সাধারণ লোকের পক্ষে সেইসব সূত্র মনে রাখা অথবা কণ্ঠস্থ করা কঠিন ছিল—এর ফলে বৌদ্ধ জনসাধারণের এইসব সূত্রের সঙ্গে পরিচয়ের গণ্ডী ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল—এই রকম অভিজ্ঞতা বৌদ্ধ সমাজের প্রায় সর্বস্তরে অনুভূত হয়েছিল—সুতরাং বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রগুলি যাতে সংক্ষেপিত ভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা যায় এবং জনসাধারণ যাতে এইসব সংক্ষেপিত সূত্র কণ্ঠস্থ করতে পারে সেই প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণ। এই প্রয়োজনানুভূতি থেকেই সূত্রগুলো ধারণী আকারে সংকলিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হলো।

মন্ত্র আর ধারণী এই দু'টি অবলম্বন করে বৌদ্ধধর্মের যে সংস্কার সাধন করা হলো তার ফলে উদ্ভূত হলো মন্ত্রযান নামে নতুন বৌদ্ধ দর্শন এবং মতবাদ। মন্ত্র এবং ধারণীর উপযোগিতা ভিত্তি করে এই মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল। বসুবন্ধু রচিত-বোধিসত্ত্ব ভূমি নামক গ্রন্থে ধারণী এবং মন্ত্রের সার্থকতা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। বসুবন্ধুর মতে ধারণী চার প্রকার—যথা ধর্মধারণী, অর্থ-ধারণী, মন্ত্রধারণী এবং বোধিসত্ত্ব বা ক্ষান্তিলাভের উপযোগী ধারণী। ধর্মধারণী বলতে বুঝতে হবে সেইসব মন্ত্র যা শোনা মাত্র শ্রুতি-বিষয়ীভূত হয়ে পড়বে এবং যার সাহায্যে প্রজ্ঞা এবং ধর্মভাব জাগরিত হবে। অর্থধারণীর সাহায্যে সম্ভব হবে ধর্মের গূঢ় অর্থ অনুধাবন করা। মন্ত্রধারণের সাহায্যে লাভ করা সম্ভব হবে পরিপূর্ণতা। ক্ষান্তিধারণী সহায় হবে ধর্মের নিগূঢ় প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভের।

মন্ত্র, ধারণী ও মূর্তি এই তিনটি ছাড়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে আরো একটি বৈশিষ্ট্য আত্ম প্রকাশ করেছিল—মুদ্রা। তন্ত্রমতে যৌগিক

সাধনার প্রধানতম অঙ্গ মুদ্রা। মন্ত্রের অর্থ সাধারণ লোকের কাছে একেবারে অনধিগম্য ছিল। ধারণী সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব ছিল কিন্তু মুদ্রাতত্ত্ব মানুষের সহজ বুদ্ধির বহির্ভূত বিষয় ছিল। ক্রমশঃ মন্ত্র দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো। বহু শব্দের সমন্বয়ে একটি বিশিষ্ট অর্থ বোঝাবার জন্য এককালে যে মন্ত্র সৃষ্ট হয়েছিল, সে মন্ত্র কালক্রমে সংক্ষেপিত হয়ে একটি বা দু'টিমাত্র অক্ষরে পরিণতি লাভ করলো। বসুবন্ধু তাঁর বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থে ইতি মিত্তি-কিত্তি প্রভৃতি কয়েকটি মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। এইসব মন্ত্রের কোনো অর্থ হয় না তবু এই ধরনের মন্ত্রোচ্চারণ ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিণতি লাভ করলো। যোগাচাররত সাধকের মনে ক্রমশঃ এই ধারণা দৃঢ়মূল হলো যে, সাধারণ বোধের অতীত তথা-কথিত অর্থহীন মন্ত্রবাক্যের মধ্যে রয়েছে মোক্ষলাভের ইঙ্গিত। মন্ত্রের অর্থহীনতা যত বৃদ্ধি পেতে লাগলো ততই সাধকের মনে মন্ত্রের প্রতি আস্থা বেড়ে যেতে লাগলো। মন্ত্রের প্রতি মোহ বৃদ্ধি ছাড়া একই সময়ে মুদ্রার সম্পর্কেও শ্রদ্ধার ভাব জনমনে স্থান লাভ করেছিল। মন্ত্র আর মুদ্রার সম্পর্কও প্রায় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। কর এবং করাঙ্গুলির বিশিষ্ট বিন্যাসের নাম মুদ্রা। মুদ্রা যোগাভ্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ।

মন্ত্র এবং ধারণীর কার্যকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে যে সহজ বিশ্বাস উদ্ভূত হয়েছিল তার ফলে লৌকিক ধর্ম, প্রাচীন হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বহুর মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং লৌকিক ধর্ম বাহ্যতঃ অনেকখানি পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে মূলতঃ প্রাচীন ধর্মীয় ভাবধারার বিচ্ছেদ ঘটে নি। মন্ত্র, ধারণী এবং যোগক্রিয়ার প্রভাব হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতেই সমভাবে অনুভূত হয়েছিল। এর ফলে অবিমিশ্র দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে ধর্মমত প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াসী হয়েছিল—কাল-ক্রমে সেই ধর্মমত রূপান্তর লাভ করলো এমনি এক লৌকিক ধর্মে

যাতে দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছিল মন্ত্র, ধারণী পূজা ও যোগাভ্যাস।

তান্ত্রিক মতবাদ পরিপুষ্ট বৌদ্ধধর্মে প্রথমতঃ একটি মূল মতবাদ স্বীকৃত হয়ে থাকলেও কালক্রমে এই ধর্মের মধ্যে নানাপ্রকার মত-ভেদ আত্মপ্রকাশ করেছিল। মতবাদের বৈষম্য হেতু তন্ত্র প্রভাবিত বৌদ্ধধর্মকে সাধারণতঃ তিনটি বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়ে থাকে —বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান।

বজ্রযানের ভিত্তি শূণ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ প্রচারিত নির্বাণ শূণ্য ছাড়া কিছু নয় এবং সুখ, দুঃখ, কর্ম ও কর্মফল সব কিছুই শূণ্য—এই মতবাদ ভিত্তি করেই বজ্রযান সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করেছিল। এই মতবাদ বিশ্লেষণ করলে হয়তো এর সঙ্গে উপনিষদ প্রচারিত কোনো কোনো মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা সম্ভব —কিন্তু তান্ত্রিক প্রভাবপুষ্ট এই ধর্মমতে ধর্মের অনুশীলন পদ্ধতি এবং ক্রিয়াকলাপের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ক্রিয়া-কলাপ বাহুল্যের সঙ্গে বজ্রযান মতবাদের ক্ষেত্রে দেবদেবীরাও বিনা আয়াসে স্থানলাভ করলেন। বুদ্ধ দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্বরাও দেবতারূপে স্বীকৃতি লাভ করলেন। দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে দেবীমূর্তির কল্পনাও স্থান লাভ করলো। এই মতবাদ অনুসারে যে সব দেবী পূজিত হতেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তারা। এছাড়া অন্যান্য দেবীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মারীচি, হারিতী, পর্ণশবরী প্রভৃতি। কাল-চক্রযানে যোগসম্মত ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। এই মতবাদের যারা প্রবর্তক—তাদের উদ্দেশ্য ছিল সর্বধ্বংসী কালকে জয় করা। আমাদের দেহস্থিত উপাদানের সাহায্যে কাল জয় করা সম্ভব। দেহের উপাদানসমূহ বশীভূত করার উপায় তিথি, নক্ষত্র, বার প্রভৃতি কালবিভাগ অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ কয়েকটি যোগ-ক্রিয়া সাধন। মন্ত্রযান এবং কালচক্রযান ছাড়া তন্ত্র প্রভাবিত বৌদ্ধ-ধর্মের আর একটি অভিব্যক্তি সহজযান। এই বিশিষ্ট মতে দেবদেবী

মন্ত্র, মুদ্রা, পূজা ও যৌগিক অনুষ্ঠান সব কিছুই স্থান লাভ করেছিল। সহজযানকে ভিত্তি করে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার অধিকাংশ তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় রচিত একাধিক গ্রন্থে এই মতবাদের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। এইসব গ্রন্থে ক্রিয়াকলাপের বাহ্যিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির উপর বিদ্রূপের কশাঘাত করা হয়েছে। সহজযানের উদ্দেশ্য পরম সুখের উপলব্ধি। এই পরম সুখ প্রকৃতি এবং পুরুষের মিলন দ্বারা লাভ করা সম্ভব। পরম সুখকর এই অবস্থায় উন্নীত হলে আত্মার ভেদ অন্তর্হিত হয়—ইন্দ্রিয় শক্তি বিলুপ্ত হয় এবং ধর্ম জীবনের চরম আদর্শ উদ্‌যাপিত হয়।

তন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম যখন পরিবর্তিত হয়েছিল সেই সময়ে হিন্দুধর্মেও নানারকম পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। সেন রাজত্বকালে বাংলা দেশে পৌরাণিক ধর্মের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু এ যুগের ধর্মজীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য তন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। তন্ত্রের প্রভাবে যেমন বৌদ্ধধর্মে তেমনি হিন্দুধর্মেও অনিবার্য রূপে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। পালযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা এবং পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য লোপ পেয়েছিল। সেন শাসন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষ অশোভন ভাবে প্রকট হয়েছিল। এই যুগে রচিত একাধিক গ্রন্থে বৌদ্ধগণের সম্পর্কে নানাপ্রকার কটূক্তি এবং বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। পালযুগে বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের যে চেষ্টা হয়েছিল তার মূলে ছিল পরমতমসহিষ্ণু মনোভাব। পাল পরবর্তী যুগে এই মনোভাব অন্তর্হিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রয়ী গ্রন্থেই শুধু বৌদ্ধ বিরোধী উক্তি স্থান লাভ করেছিল তা নয়—বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরোধী বহু মন্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু উভয় ধর্মমতালম্বীদের মধ্যে মতবিরোধিতা সত্ত্বেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে উভয় ধর্মমতের উপর তন্ত্রের প্রভাব হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অনেকগুলি বিষয়ে খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছিল।

সেন রাজারা যখন বাংলার সিংহাসনে আসীন তখন উত্তর ভারতে মুসলমান আক্রমণের তাণ্ডব চলছে। মুসলমানদের আবির্ভাব ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি অভাবিতপূর্ব সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে ধর্মবিষয়ক যে সব মতভেদ ছিল—তুর্কী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সব মতভেদ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়ে ধর্মক্ষেত্রে মতভেদের পরিসর অনেকখানি সঙ্কীর্ণ করে এনেছিল। একদিকে তন্ত্রমতের প্রভাব অপর দিকে ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে পরস্পরের প্রতি তাদের বিমুখতার ক্ষেত্র অনেকখানি সঙ্কুচিত করে এনেছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের শেষ পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে গণ্য হতে পারে এমনি আর কোনো রাজবংশ অবশিষ্ট রইলো না। রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার এবং নিজেদের সম্প্রদায়গত অনৈক্যের ফলে বৌদ্ধধর্মের আবেদন জনমানস থেকে ক্রমশঃ লোপ পেতে লাগলো। এই অবস্থায় বৌদ্ধাচার্যেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তাদের দূরত্ব 'ঘোচাতে চাইলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সে বিরাট অংশ হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিভেদ দূর করার পক্ষপাতী ছিল, তারা কালক্রমে হিন্দুধর্মের আওতায় এসে পড়লো। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়েও যাঁরা হিন্দুধর্মের সঙ্গে নিজেদের অভিন্নতা ঘোষণা করতে সম্মত হলেন না, তাঁরা পূর্বাচরিত বৌদ্ধধর্মের সকল নীতি না মেনে নূতনতর ভাবে মত এবং বিশ্বাস অবলম্বন করে একটি নূতন সম্প্রদায়ে পরিণতি লাভ করলেন। নব্যতন্ত্রের এই বৌদ্ধগণ সহজ বা সহজিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। এদের মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে কোন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পারে নি এবং এরা চিরকালই একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হয়ে এসেছে কিন্তু সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব-ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এদের দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যযুগের ধর্ম সম্পর্কে যাঁরা গভীরভাবে আলোচনা করেছেন

তাঁদের মতে নাথধর্ম সহজিয়াপন্থী ধর্মমত থেকে উদ্ভূত। এই সম্বন্ধে বিদ্বজ্জন মহলে মতভেদের অবকাশ আছে এবং এ সম্পর্কে সর্বজন-গ্রাহ্য কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি।

নাথধর্মের উৎপত্তি যে সূত্র থেকে হোক না কেন আচার ও রীতি-নীতির দিক থেকে তন্ত্র প্রভাবিত বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তন্ত্রের প্রভাবহেতু এই সময় হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। এই সময়কার ধর্মজীবন সম্পর্কে আরো একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে—সেটি শাক্ত ধর্মমতের প্রাধান্য। শক্তি-পূজা বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে পূর্ব-ভারতে এবং অন্যান্য স্থানে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তন্ত্রমতের প্রসারের পর থেকে জনমানসে শক্তিধর্ম একটি নূতনরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। পরবর্তী দু'শো বছর ধরে তন্ত্রপ্রভাবিত শক্তি ধর্মই ছিল পূর্ব-ভারতে জনগণ কর্তৃক আচরিত প্রধানতম ধর্ম।

মধ্যযুগের ধর্মজীবনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তান্ত্রিক প্রভাবিত ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধধর্ম স্বাভাবিক নিয়মে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আপন সার্থকতা খুঁজে পেতো—এ অনুমান অসত্য নয়। কিন্তু এই যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটলো পটপরিবর্তনের এক বিরাট মহড়া। ইসলামের জয়যাত্রা শুধু রাজনৈতিক দুর্দৈবের আকারে দেখা দেয় নি; ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের অভ্যুদয় সৃষ্টি করেছিল এক বিরাট সমস্যা। হিন্দুধর্ম বিরোধী এই ধর্মমতের আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়েছিল ভারতীয় ধর্মে ও সংস্কৃতিতে। এর ফলে হিন্দুধর্মের নায়কদের মনে দেখা দিয়েছিল এক রক্ষণশীল মনোভাব। এর প্রভাবে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায় আপন আপন ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছিল। এই সচেতনতাবোধ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে

পরস্পরের কাছাকাছি আনবার পথে সৃষ্টি করেছিল গভীর বাধা। যদি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিম অভ্যুত্থানের আলোড়ন দেখা না দিত তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে সম্প্রদায়গত বিভিন্নধর্ম, চিরাচরিত সমন্বয়ের পথে বিভেদ ও স্বাতন্ত্র্য দূর করে দিয়ে একটি সমদর্শী আদর্শ রচনা করতে পারতো। কিন্তু এই সমন্বয়-ধর্মিতার ফলে হিন্দুধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন এবং সংরক্ষণশীল হয়ে উঠলো। পঞ্চদশ এবং যোড়শ শতকের প্রথমভাগে যে সব ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার মধ্যে এই রক্ষণশীল মনোভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই রক্ষণশীল মনোভাব শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেনি। সুপ্রাচীন কাল থেকে যে সব বহিরাগত জাতি ভারতবর্ষে এসেছিল তাঁরা একে একে সকলেই ভারতীয় জনসমুদ্রের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। ভাষায়, পরিধানে, ধর্ম-বিশ্বাসে তাঁরা ভারতবাসী বলে পরিচয় দানে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু ইসলামধর্মের ধ্বজাবাহী হয়ে যাঁরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং ভারতের রাজলক্ষ্মী যাঁদের করতলগত হয়েছিলেন তাঁরা বিদেশাগত অন্যান্য জাতির মত জাতীয় ধর্মীয় এব্বং সাংস্কৃতিক সত্ত্বা বিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন আত্মস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এই কারণে অন্যান্য বিদেশাগত জাতিদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল ভারতে আগত ইসলাম ধর্মীদের ক্ষেত্রে সে রকম ঘটেনি। ইতিহাস এবং বিধাতা তাদের ভাগ্যলিপি রচনা করেছিলেন স্বতন্ত্রভাবে।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের স্বাতন্ত্র্য ঐতিহাসিক সত্য কিন্তু সবটুকু সত্য নয়। ইসলাম আপন স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করেছে একথা যদি সত্য হয় তাহলে ইসলাম ভারতীয় ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং ভারতীয় ধর্মের উপর আপন প্রভাবের স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে একথাও সমান সত্য।

ইসলাম আক্রমণের প্রথম ঝড়-ঝাপ্টা কেটে যাবার পর ভারত-বর্ষের জীবনে মোটামুটি স্থৈর্য যখন ফিরে এলে তখন ভারতবর্ষের

অবিনাশী আত্মা সনাতনী প্রথায় বহিরাগত এই সম্প্রদায়কে ভারতীয়-করণের আওতায় আনতে প্রয়াসী হলো। পঞ্চাদশ ও ষোড়শ শতকের ইতিহাসে অনেকখানি পরিসর জুড়ে রয়েছে স্বাঙ্গীকরণের মহতী প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার প্রথম পরিচয় বহন করে পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে এবং ষোড়শ শতকের রচিত বিভিন্ন শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ। এককালে রক্ষণশীলতার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে ধর্মজীবনের স্বাতন্ত্র্য ও পবিত্রতা রক্ষার প্রতি যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটলো উদার ভক্তিপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশে। এই ভক্তিধর্মের প্রবল বন্যায় ভেসে গেল সব সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি, আচারগত বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব এবং ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য। ভক্তিবাদকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষ ধর্ম এবং সংস্কৃতি আপন সার্থকতা পরিপূরণে উদ্যত হলো। বিভেদ ও অনৈক্যের পথে আচারবহুল ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যে ভারতীয় ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে যে গতিহীনতার আভাস দেখা দিয়েছিল, ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থানে ভারতীয় ধর্ম জীবনের স্রোতে দেখা দিল দুর্বার গতিবেগ।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন সংঘাত ও বিরোধের পথেই সম্ভব হয় প্রগতি। ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে প্রগতির সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। প্রগতির নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি ধর্মের ক্ষেত্রে হয়তো অচল। কারণ ধর্ম সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনিষ্ঠ নয় অন্ততঃ সাধারণভাবে যাঁরা ধর্মের অনুশাসণ মেনে চলেন তাঁদের কাছে। কিন্তু প্রগতির কথা ছেড়ে দিলেও একথা সহজেই মেনে নেওয়া যায় যে সংঘাত বিরোধ বহুক্ষেত্রে দেখা দেয় মহামিলনের পীঠভূমি রূপে। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে যে সব বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল তাঁরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ভুলে গিয়ে একটি অভিন্নধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তা নয়—কিন্তু তাঁরা পরস্পরের প্রতি অধিকতর সহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন এবং এক ধর্ম সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার অংশতঃ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস

প্রাচীনযুগে সমন্বয় প্রচেষ্টার যে পরিচয় বহন করে মধ্যযুগেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

মধ্যযুগে যে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল তাঁরা ইসলামধর্মের সান্নিধ্যে এসে হয়তো বা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছিল। আমরা ইতিপূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের উপর তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তন্ত্রের প্রভাব হেতু বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম বহুবিষয়ে পরস্পরের আচার-রীতি-নীতি এমন কি মতবাদ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিল। যাঁরা বৌদ্ধ মতে সহজযান-পন্থী এবং যাঁরা শাক্ত মতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী, সাধন প্রণালীর ক্ষেত্রে তাঁদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অন্যান্য সম্প্রদায় সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। ইসলাম অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যে রক্ষণশীল মনোভাব সঞ্চারিত হয়েছিল—কালক্রমে তার জায়গায় দেখা দিয়েছিল উদার সহিষ্ণুতামূলক সমন্বয়ধর্মী মনোভাব।

এই মনোভাবেই বাংলাদেশে এবং অন্যান্য প্রদেশে ভক্তি ধর্মের বহুল প্রসার সম্ভব করে তুলেছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ভক্তিবাদী ধর্মের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলে বাংলা তথা ভারতের ধর্মক্ষেত্রে ঘটেছিল এক বিস্ময়কর পরিবর্তন। এই পরিবর্তন মাত্র কয়েকটি বছরের ব্যবধানে সম্ভব হয়নি। বহু বৎসর ব্যাপী এবং বহুজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এই ধর্মমতের ব্যাপক প্রচলন সম্ভবপর হয়েছিল। ভক্তিবাদের ব্যাপক প্রচলনের পূর্ববর্তী যুগ ধরে চলেছিল এর প্রস্তুতি পর্ব। এই প্রস্তুতিতে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল তৎকালীন যুগে প্রচলিত প্রায় প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রথম যখন ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল তখন ইসলাম ভারতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দিয়েছিল। ইতিপূর্বে বহু বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে তাদের অভিযান চালনা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা কেউই একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাবয়ব ধর্ম সম্প্রদায়

রূপে পরিণতি লাভ করেননি। এই কারণে তাঁরা যত সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় সমাজ এবং ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন—আপন স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ইসলাম ধর্মের অনুচরদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি; কিন্তু মধ্যযুগে পর পর বহু শতাব্দী ধরে পরস্পর কাছাকাছি বসবাস করার ফলে তাঁদের আত্মসচেতনতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল। তাছাড়া একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে বহু অমুসলমান নরনারী স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ইসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল—কালক্রমে অমুসলমান ধর্ম সম্প্রদায় থেকে দীক্ষান্তরিত মুসলমানরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন—এঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু পূর্ব সংস্কার এবং পূর্বপুরুষদের আচরিত রীতি-নীতির সঙ্গে এঁরা সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেননি। এই কারণে ধর্মান্তর গ্রহণের পরেও এঁরা মনের দিক থেকে অহিন্দু বা হিন্দু-বিরোধী আদর্শ গ্রহণ করেননি। হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এঁদের মন থেকে কোনকালেই সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়নি। এই সকল কারণে ইসলামের আবির্ভাবের এক শতাব্দীকাল পর থেকেই ভারতীয় ধর্মক্ষেত্রে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের দিকে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এই সমন্বয়ধর্মিতা পল্লবিত হয়ে উঠেছিল এক দিকে সুফী ধর্ম অপর দিকে বৈষ্ণব ধর্মকে আশ্রয় করে। এই উভয় ধর্মমতই ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুফীধর্মের আবির্ভাব এবং প্রসার সম্পর্কে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম এই ধর্মমত যখন পূর্ব-ভারতে প্রচারিত হয়েছিল তখন জনচিত্তে এর কোন ব্যাপক প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়নি। পঞ্চদশ-ষোড়শ-শতকে পূর্ব-ভারত অঞ্চলে সুফী ধর্মের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল—আর এই সময়েই বাংলা ও উত্তর ভারতে বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা জনচিত্ত গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। এই দু'টি ধর্মমত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে যে প্রাধান্যলাভ করেছিল সেটি কোন আকস্মিক কারণ সম্ভূত নয়। তন্ত্র প্রভাবিত

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম ক্রিয়াকাণ্ড আচারবহুল অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মরূপে পরিণতি লাভ করেছিল। এই দু'টি ধর্মমতের অনুষ্ঠানবহুল অরণ্য পথে ধর্মানুসন্ধানকারীরা অনিবার্য রূপে পথভ্রষ্ট হতেন। যে সব নিগূঢ় ও গোপন ক্রিয়াকলাপ তান্ত্রিক, শৈব ও বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল—জনসাধারণের কাছে সেগুলো ছিল দুর্বোধ্য। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রচলনের পূর্বে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড-বহুল ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে যে ঔদাসিন্য এমন কি কতকটা বিতৃষ্ণার ভাব দেখা দিয়েছিল পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে তন্ত্রপ্রভাবিত পৌরাণিক ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধেও জনমানসে প্রায় সেইরূপ প্রতিকূল ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল।

বৈষ্ণব ধর্মের আবেদন ছিল আরো ব্যাপক। বৈষ্ণব ধর্মমতে যে সব তত্ত্ব ও তথ্য অন্তর্নিহিত ছিল সে আলোচনা স্থগিত রেখে প্রথমে সমাজ এবং ধর্মজীবনের কোন্ বিশেষ অবস্থায় এই ধর্মের প্রচলন সম্ভব এমন কি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তা আলোচনা করলে দেখা যাবে যে মধ্যযুগের ধর্ম ও সমাজ-জীবনে যে বৈষম্য, বিভেদ ও বিদ্বেষ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় যে যুগেই হয়ে থাক না কেন চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে এই ধর্মমত বাংলা এবং ভারতের নানাস্থানে জনসাধারণের মনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তৎকালীন যুগের সমাজ দেহে যে বিদ্বেষ ও বৈষম্য সংক্রামিত হয়েছিল তার মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজন ছিল এমনি একটি বিশ্বজনীন ধর্মমতের। তন্ত্র প্রভাবিত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার বহুলতা এবং গোপন গূঢ় প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম সহজেই জনচিত্ত আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই—হিন্দু ও মুসলমানে কোনো প্রভেদ নেই, ভক্তিই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, 'ভক্তিপরায়ণ তথাকথিত নীচ জাতির ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়েও বড়'—চৈতন্য প্রচারিত

এই মতবাদ ভারতীয় সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে সহজেই সাগ্রহে গৃহীত হয়েছিল।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে যে সব বিভিন্ন ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছিল সেই সব মতবাদ মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তাধারা প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু মধ্যযুগেও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে জনসমানসের প্রকৃতি বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছিল—এবং এই পরিবর্তনের ফলে মধ্যযুগে এমনি বিভিন্ন ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছিল, যাদের সঙ্গে প্রাচীন যুগের ধর্মমতের সম্পর্ক থাকলেও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য দ্বারা তারা চিহ্নিত হয়েছিল। মধ্যযুগের বিভিন্ন ধর্মমতের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করলে তাদের মধ্যে কতকগুলো বিষয়ে মৌলিক ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়।

লৌকিক ধর্মের প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনীতিক পরিবেশ দ্বারা সকল ধর্মই প্রভাবিত হয়ে থাকে। ধর্মের মূল কথা 'নিহিতং গুহায়াম্'। গুহাশ্রিত এই তথ্যটির সন্ধান যদি পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে যে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে যে সব ধর্মমত প্রচারিত হয়েছে তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও মূলগত একটি ঐক্য সহজেই লক্ষ্যণীয়। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ধর্মমতের মধ্যে যদি মৌলিক ঐক্য বন্ধনের আবিষ্কার সম্ভব হয় তাহলে আশা করা স্বাভাবিক যে একই দেশে বিভিন্ন যুগে যে সব ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যেও মূল বিষয় ঐক্য দেখা যাবে।

পূর্ব-ভারতে যখন আর্য প্রভাব বিস্তৃত হয়নি তখন থেকেই বাংলার সমাজে কৌম চেতনা গভীর ভাবে অনুভূত হয়েছিল। আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশের ধর্ম ও সমাজ জীবনে যে সব অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকলাপ স্বীকৃতি লাভ করে এসেছে, তাদের মূলে কৌম সমাজের প্রভাব সুস্পষ্ট একথা সমাজবিজ্ঞানীদের মহলে গৃহীত হয়েছে। তারপর দীর্ঘকালের ব্যবধানে বাংলা দেশে আর্য সংস্কৃতিপুষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন প্রাধান্য লাভ করেছিল তখনও প্রাক্

৭

আর্য সংস্কার বর্জন করা বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যখন পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্মের বন্যা বয়ে চলেছিল তখনও কৌম সমাজ থেকে গৃহীত আচার-অনুষ্ঠান বাঙ্গালী বর্জন করেনি। পাল শাসন যুগে বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গালীর প্রতিভাস্পর্শে নতুন জীবন লাভ করেছিল। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের ইতিহাস আলোচনা করলে পৌরাণিক ধর্মের প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত হয়েছিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পৌরাণিক ধর্ম পুরাতন আর্য প্রভাব পুষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্মের হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়। এই যুগের পৌরাণিক ধর্ম এবং বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম উভয়েই তান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই ভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে পূর্ব ভারত অঞ্চলে যে ধর্মমত সাধারণ্যে প্রচার লাভ করেছিল—সেই ধর্মমত গঠিত হয়েছিল আর্যেতর, আর্য এবং বেদবিরোধী তিনটি স্বতন্ত্র ধারার মিলিত স্রোতে। এই তিনটি স্বতন্ত্র ধারাকে পরস্পর মিলিত হতে সাহায্য করেছিল তান্ত্রিক মতবাদ। তন্ত্রের মাধ্যমে বৌদ্ধ বৈদিক এবং কৌম সমাজ থেকে গৃহীত মতবাদ পরস্পরের কাছাকাছি এসে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুনভাবে স্বাঙ্গীকরণের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিল।

পূর্বে যে তিনটি স্বতন্ত্রধারার উল্লেখ করা হয়েছে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল আরো হু'টি ধারা—একটি সুফীধর্ম অপরটি বৈষ্ণব ধর্ম, হু'টি ধর্মমতই আপন আপন প্রাণশক্তি সংগ্রহ করেছিল ভক্তিবাদ থেকে। বাংলার মুসলমান শাসনের অব্যবহিত পরেই সুফীধর্ম প্রচার লাভ করেছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতকের আগে সুফী মতবাদ পূর্ব-ভারতে সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করেনি। পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলা দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল ; তাছাড়া ষোড়শ শতকে ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর অপরাপর দেশের যোগ-সূত্র ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল। এর ফলে বাংলার জনমানসে উদার-পন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে

ভারতবাসীর জনমানস আরো একটি ধর্মমত দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিল। এই মতটি শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম। বৈষ্ণব ধর্মের সূচনা আরো পূর্বেই হয়েছিল—কিন্তু প্রাক্-চৈতন্য যুগে জনসাধারণের মধ্যে এই মতবাদটি তেমনভাবে গৃহীত হয়নি। শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যমে প্রেমধর্মের যে প্লাবন এনে দিয়েছিলেন তাতে অবগাহন করে আর্যাবর্তে বিশেষতঃ বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী তাদের জীবনের ধারায় এনেছিল বিরাট বিস্ময়কর বিচিত্র পরিবর্তন। বাঙ্গালী জাতির মনে বৈষ্ণব ধর্ম যে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। তার প্রভাব বহু শতাব্দী অতিক্রম করে আজও বাঙ্গালীর অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়নি। মধ্যযুগে যে সব ধর্মমত প্রচারিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কোনটিও বৈষ্ণব ধর্মের মত অত ব্যাপক এবং গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এই ধর্মমত প্রচারিত হওয়ার আগে বাংলা দেশের ধর্মস্রোতে খানিকটা মন্থরতা এবং পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য, মানুষে মানুষে ভেদ, ক্রিয়াকলাপ, যোগ-বিধির বাহুল্য এবং গোপনতা মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। বিধি নিষেধের কড়াকড়িতে মানবাত্মা নিগৃহীত হচ্ছিল। সেই অবস্থা থেকে মানুষের গুণের স্থবিরতা দূর করার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য। ভক্তির পথ বেয়ে নেমে এলো মুক্তির বাণী। নিপীড়িত মানবাত্মা মানুষের জয়গানে উল্লসিত হয়ে উঠলো। বিধি-নিষেধ, ক্রিয়া-কাণ্ড, জপতপের আড়ম্বর থেকে সহজ সরল সত্যের রাজ্যে বিচরণ করতে পেয়ে মানুষের আত্মা সেদিন মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল।

মানুষের ইতিহাসে এমনি অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারে বারে যুগে যুগে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শ যখন উপনিষদের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে ক্রিয়াকাণ্ডবহুল যাগযজ্ঞ সর্বস্ব অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়ে উঠেছিল, তখনও ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু মানুষ এমনি অসহায় বোধ করেছিল। ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতার মধ্যে সেদিনও এমনিভাবে মানুষের আত্মা মুক্তিপথের সন্ধান হারিয়ে ফেলেছিল। এমনি

বিভ্রান্তির যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর জৈন। এঁরাই সেদিন মুক্তিপথ যাত্রী মানুষের কানে শুনিয়েছিলেন মুক্তির মহাবাণী। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিককে দেখিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী আলোকের সন্ধান। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সেদিন অমৃত পথযাত্রার অধিকার অর্জন করেছিল। বুদ্ধ, মহাবীরের উপদেশের সঞ্জীবনী স্পর্শে সেদিনকার ধর্মজীবনের সকল গ্লানি, সকল কালিমা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবাসী সেই আলোতে পেয়েছিল নতুন পথের সন্ধান।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ঘটেছিল এমনি এক 'তিমিরবিদার উদার, অভ্যুদয়'—যে অভ্যুদয়ের স্রষ্টা শ্রীচৈতন্য। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে শ্রীচৈতন্যের অবদানের গুরুত্ব কিছুমাত্রও ক্ষুণ্ণ না করে একথা বলা যায় যে তদানীন্তন সমাজ ও অর্থনীতির প্রয়োজনে এমনি সর্বজনীন ধর্মমতের প্রয়োজন হয়েছিল। আর সেই প্রয়োজন তৃপ্ত হয়েছিল শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্মের মাধ্যমে। সুফীধর্মের প্রভাব বৈষ্ণব ধর্মের মত অত ব্যাপক না হলেও উপেক্ষনীয় নয়। বাংলা এবং ভারতের এক শ্রেণীর জনসমাজে সুফীমতের প্রভাব বিশেষ-ভাবে অনুভূত হয়েছিল। সুফীমতের সমর্থকরা ভক্তিবাদের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বৈষ্ণব ও সুফী এই দু'টি ধর্মমত বাংলার ধর্ম-জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার ফলে ক্রিয়াকাণ্ডবহুল, আড়ম্বর-প্রধান ধর্মের আবেদন জনমনে অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল কিন্তু একেবারে নির্মূল হয়নি। সমাজে যখন যে ধর্মের প্রচলন হয়—সে ধর্ম গোড়াতে যে মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন কালক্রমে সেই ধর্ম সমাজের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। কোন ধর্মই সমাজ নিরপেক্ষ ভাবে গড়ে উঠতে পারে না। ধর্ম যতক্ষণ ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তার মধ্যে বিশেষ পারিবর্তন ঘটে না, কিন্তু ব্যক্তির গণ্ডী অতিক্রম করে ধর্ম যখন ব্যষ্টির জীবনে প্রবেশ করে তখন তার গতি ও প্রকৃতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয় সেই সমাজের সাধারণ গ্রাহ্য ভাব এবং সংস্কার দ্বারা।

প্রাচীনকাল থেকে সুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে যে সব ধর্মমত পূর্ব ভারত অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছিল তাদের প্রভাব মধ্য যুগেও নির্মূল হয়ে যায়নি। শ্রীচৈতন্য এবং সুফী সাধকেরা ভক্তি-সর্বস্বতাকে ধর্মের প্রধান উপজীব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও বহুকাল পূর্ব থেকে জনসাধারণের মনে মন্ত্র তন্ত্র ক্রিয়া-কাণ্ড জপতপ যে প্রভাব বিস্তার করে এসেছিল তার উচ্ছেদ সাধন সম্ভব হয়নি। একদিকে যোগ যাগ, অপরদিকে ভক্তিমাত্র সম্বল করে ইষ্টলাভের চেষ্টা—এই দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির রীতি ধর্মজীবনে বহুকাল পর্যন্ত স্বীকৃতিলাভ করে এসেছিল। দু'টি বা ততোধিক বা মতবাদ যখনই প্রচারিত হয়েছে তখন কিছুকাল পর্যন্ত তারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছে, কিন্তু কালক্রমে তাদের স্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়ে তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। তারপর কবে কোনকালে হয়তো বা তাদের অলক্ষ্যে পরস্পর মিলে-মিশে একটি মতবাদে পরিণতি লাভ করেছে। যুগে যুগে ধর্মজীবনে তেমনি পরিণতি ঘটতে দেখা গেছে। তন্ত্রপ্রভাব পুষ্ট হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে দশম-একাদশ শতক থেকে যে সব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা এবং যোগ অভ্যাস ও মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ইষ্টলাভের সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ।

পঞ্চদশ শতকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ছাড়া আরো একটি ধর্মমত ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়েছিল। এই ধর্মমত মরমিয়া সাধকের ধর্ম। বৈষ্ণব ধর্ম এই ধর্মেরই একটি বিশিষ্ট প্রকাশ। রামানুজ, কবীর, রামানন্দ, বল্লভাচার্য,একনাথ,গুরুনানক এঁরা এই ধর্মমতের প্রবর্তন করেছিলেন। ভক্তিবাদের প্রাধান্যের উপর এঁদের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুফী, সহজিয়া, বৈষ্ণব, মরমিয়া মতবাদ ভক্তিবাদেরই বিভিন্ন রূপ।

বাউল ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে। এই ধর্মমতের সূচনা আরো আগেই হয়েছিল, কিন্তু পূর্ণাবয়ব একটি ধর্মমত হিসেবে এটি আত্মপ্রকাশ করেছিল সপ্তদশ শতকে। এই

ধর্মমতের উৎপত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাংলার সামাজিক, রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ধর্মের উপর সমাজ-জীবনের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। সমাজের প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের আবির্ভাব ঘটে থাকে। সমাজসেবা ধর্মের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। যখন সমাজ-জীবনে যে সমস্যা দেখা দেয় তখন সেই সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়—নূতন ধর্মের প্রচার তাদের অন্যতম। বাউলধর্ম ও সাধনার আবির্ভাবের পিছনেও সমাজ-জীবনে তাগাদা অন্তর্নিহিত রয়েছে। বাংলা দেশের পরিচয় তখন সুবে বাংলা; মোগল যুগেই সর্বপ্রথম গোটা বাংলা মুসলমান শাসনের অধীনে আনীত হয়েছিল। মোগল সাম্রাজ্য তখন গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। তুর্কী-আফগান শাসন যুগে বাংলা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মোগল শাসনের মাধ্যমে বাংলা দেশের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, মোগল যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটেছিল। এই সময় পারস্য থেকে সুফী ধর্মাবলম্বী বহু পণ্ডিত এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা দেশে এসে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করেছিলেন। সুফীধর্ম প্রধানতঃ ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইখানে সন্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সুফী ধর্মমতের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। এই উভয় ধর্মমতের প্রভাব গভীরভাবে বাংলার জনচিত্তে অনুভূত হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব যেমন অগণিত হিন্দু নরনারীর মনকে প্রেমধর্মে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল, তেমনি সুফীধর্মও মুসলমান নরনারীকে ক্রিয়াকাণ্ডের বাহুল্য বর্জন করে সহজ সরল পথে ইষ্টলাভের সন্ধান দিয়েছিল।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে সুরু করে ষোড়শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বাংলা দেশে একদিকে বৈষ্ণবধর্ম অপরদিকে সুফী

ধর্মের প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল। এই দু'টি ধর্মমতই মানুষকে অনুষ্ঠান বাহুল্যের পথ পরিহার করে ভক্তিশুদ্ধ অন্তরে ঈশ্বর উপাসনার সন্ধান দিয়েছিল। এদের সহজ সরল মতবাদ সহজেই জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু এই দু'টি ধর্মের প্রাধান্য সত্ত্বেও বহু যুগ থেকে যে সব ধর্মমত প্রচারিত হয়ে এসেছিল, সেইসব ধর্মমতের প্রভাব নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষের ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে একটি ধর্মমত দ্বারা অপর ধর্মমতের উচ্ছেদ সাধনের দৃষ্টান্ত বিরল। ভারতবর্ষের ধর্মীয় সাধনার ইতিহাস চিরকাল সমন্বয়ের জয়ধ্বজা উড্ডীন রেখেছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেও বাউল ধর্মের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই সমন্বয় ধর্মিতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বহুতর ধর্মের প্রবাহ মিলিত হয়ে বাউল ধর্মের উৎস সৃষ্টি করেছিল। সুফী ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ছাড়া অন্যান্য ধর্মমতের প্রভাব বাউলধর্ম ও মতবাদ গঠনে সহায়তা করেছিল।

বাউলধর্মের উৎপত্তি ও গতি আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথাটি সর্বাগ্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন সেটি হলো এই যে, বাউল মতবাদ কোন-একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থে একসঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়নি। বাউলদের গানে কবিতায় তাদের মত ও পথ যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তাতে বাউল-সাধনার একটি সামগ্রিকরূপ পাওয়া কঠিন—কিন্তু তাহলেও এই ধর্মমতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। এইসব বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখা যায়—সুফী ও বৈষ্ণব মতবাদ ছাড়া আর যেসব প্রাচীনতর ধর্মমত বাউল মতবাদের উপর তাদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তাদের মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক এবং সহজিয়া সাধনা-পদ্ধতি অন্যতম।

তন্ত্রধর্মের প্রভাব পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উপর অনুভূত হয়েছিল সেকথা ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। বহুতর দেবদেবীর পূজা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কাণ্ড জটিল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তন্ত্র প্রভাবিত ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল

যোগাভ্যাস। কয়েকটি নির্দিষ্ট রীতি ও নীতি অনুসরণ করে এই যোগাভ্যাস বিধেয় ছিল। যোগ-প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত প্রাচীনতর ধর্মসাহিত্যে পাওয়া গেলেও ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের আগে পূর্ব-ভারত অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রচলন হয়নি। তন্ত্রের প্রভাবে শুধু যোগাভ্যাসের উপরেই গুরুত্ব আরোপিত হয়নি ; কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্মনীতিও সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত এবং গৃহীত হয়েছিল। এইসব নীতির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কায়া বিষয় কতকগুলি তথ্য। দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যোগ সাধনের মধ্যে দেহের গুরুত্ব সীমাবদ্ধ করা হয়। দেহকে পরমপুরুষের অবস্থান ভূমি বলে কল্পনাও করে নেওয়া হয়েছিল। তান্ত্রিক প্রভাবপুষ্ট বৌদ্ধাচার্যদের মতে দেহের মধ্যে ছিল বজ্রসত্ব। এই বজ্রসত্বকে জন্ম-মৃত্যু অতীত, সর্বত্র সর্বজ্ঞ শক্তিস্বরূপ বলে ধারণা করা হয়েছে। হিন্দু তান্ত্রিকদের মতে দেহের মধ্যে পরমাত্মার অবস্থিতি কল্পনা করা হয়েছে। দেহের মধ্যে যে পরমশক্তির অবস্থান তাঁকে উপলব্ধি এবং লাভের একমাত্র উপায় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যোগাভ্যাস।

সহজযানীদের মতে পরমপদ লাভই ছিল ধর্ম-সাধনার প্রধানতম লক্ষ্য। পরম মহাসুখের উপলব্ধির মধ্যেই পরমপদের সন্ধান নিহিত রয়েছে—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সহজপন্থীরা পরম মহাসুখ লাভের য উপায় নির্দেশ করে গেছেন তার মধ্যে যোগাভ্যাস অন্যতম। সহজযান তন্ত্রে প্রকৃতি পুরুষে মিলন দ্বারা মহাসুখ অথবা সহজের উপলব্ধি সম্ভব—একথা প্রচার করা হয়েছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা অনুষ্ঠানবিরোধী ছিলেন। তাঁরা শাস্ত্রবাক্যের অসারতা তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের অন্তঃসারশূন্য ভস্মলেপন এবং জটাভার বহনের অনাবশ্যকতা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁদের মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বেদ-পুরাণ আগম শাস্ত্রের বিধি বিধান সম্পর্কে যে সব উক্তি করে গেছেন সে সব থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা বেদ-পুরাণ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন, কিন্তু সাধনমার্গ সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের রচিত গ্রন্থে যে সব

নির্দেশ রেখে গেছেন তা থেকে গুরুবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও পৌরাণিক তান্ত্রিক উভয় ধর্মমতেই গুরুর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহমধ্যস্থিত বজ্রসত্ব অথবা পরমাত্মার উপলব্ধি সম্ভব এবং এইসব প্রক্রিয়া যাতে যথাযথ ভাবে পালিত হতে পারে সেজন্য প্রয়োজন সদ্‌গুরুর।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে এবং ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে বৈষ্ণব ধর্মে প্রসারহেতু অনুষ্ঠানিক ধর্মের মাহাত্ম্য অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। সহজ মনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি আশ্রয় করে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে—এই শিক্ষা প্রচারিত হওয়ার ফলে অনুষ্ঠান-বহুল ধর্মের আবেদন জনমানসে অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। একদিকে যৌগিক সাধক পদ্ধতির গুরুত্ব এবং অপরদিকে ভক্তিসর্বস্ব আত্মনিবেদনের আবশ্যকতা এই দু'টির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই জনগণকে কিছু পরিমাণে বিভ্রান্ত করে থাকবে। কিন্তু এই সমস্যারও সমাধান হলো, বিভ্রান্তির নিরসন ঘটলো। যৌগিক প্রক্রিয়ার এবং অনুষ্ঠানবহুল ধর্মের অসারতা সম্পর্কে সাবধান বাণী প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তকেরাও অনুষ্ঠানবহুলতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করে জনসাধারণের মনে এ সম্পর্কে যেটুকু সন্দেহ পরায়ণতা ছিল তা দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ার মাহাত্ম্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাও বিশ্বাসের ভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। পরবর্তী যুগে বাউল সাধকেরা যোগাভ্যাসের গুরুত্ব অস্বীকার করলেও গুরুবাদের আদর্শকে বর্জন করতে পারেন নি। তাঁরা যোগ প্রাণায়ম বর্জন করলেও গুরুবাদ বর্জন করেননি এবং গুরুবাদের গুরুত্ব স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে তারা যৌগিক ধর্মে বিশ্বাসী এবং যোগবিরোধী এই দু'টি পরস্পর-বিরোধী মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁদের এই প্রয়াস যে অনেকাংশে সাফল্য লাভ করেছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে, বাংলা ও পূর্ব-ভারতের ধর্মীয় ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে।

বৈষ্ণবধর্ম থেকে বাউল সাধকেরা শুধু ভক্তিবাদের আদর্শকেই গ্রহণ করেননি. তারা রাধাকৃষ্ণ মিলনতত্ত্ব থেকেও অনেকখানি প্রেরণা লাভ করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের মিলন যে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটি বৈষ্ণব ধর্মাচার্যগণই সর্বপ্রথম প্রচার করেননি। তন্ত্রে প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তন্ত্র প্রভাবিত বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে মিথুনাত্মক বহু আলোচনা স্থানলাভ করেছে। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের মিলনকে কেন্দ্র :করে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা যে তন্ত্র পরিবেশন করেছিলেন। তার উৎস প্রাগ্ বৈষ্ণব যুগে প্রচারিত হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতের মধ্যেই নিহিত ছিল। এই তত্ত্বের বহুল প্রচারের প্রভাব থেকে পরবর্তী যুগের ধর্মগুরুগণ নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেননি। বাউল ধর্মীরাও এর প্রভাব অস্বীকার করেননি। এই তত্ত্বের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখা যাবে যে দেহাত্মক প্রেমের ভিত্তির উপর এই তত্ত্বটি রচিত হয়েছে। এই মূল তত্ত্বের সঙ্গে আরো একটি তত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। এই তত্ত্বটি দেহাত্মক প্রেমের মূল কেন্দ্র দেহকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। রক্ত মাংসে গড়া মানুষের দেহের পরিচয় রক্ত-মাংসের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দেহের আরো একটি মহত্তর পরিচয় দেহের ভিতর পরমপুরুষ বাস করেন। পরমপুরুষের তত্ত্ব বাউল গানে প্রচারিত হয়েছে। দেহের মধ্যেই যে পরমআত্মার অধিষ্ঠান এ তত্ত্ব বাউল ধর্মের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব থেকেই প্রচারিত হয়েছিল। উপনিষদে দেহকে পরমাত্মার আধার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তান্ত্রিক হিন্দুধর্মে এবং বৌদ্ধ সহজপন্থীদের প্রচারিত মতবাদে দেহকে একটি আধ্যাত্মিক রূপ দেবার সচেতন প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাউল প্রচারিত দেহতত্ত্ব মূলতঃ নতুন কোনো তত্ত্ব নয়, কিন্তু নতুন না হলেও বাউল সাধকরা যে ভাবে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন—সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বাউলপন্থীরা দেহের ভিতর ভগবানের অস্তিত্ব রয়েছে এ মতবাদ প্রচার করেননি—তাঁরা দেহের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন

মনের মানুষের উপস্থিতি। বাউলদের রচিত অসংখ্য গানে, কবিতায় মনের মানুষের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। তাদের সাধনার ক্ষেত্রে মনের মানুষ একটি প্রশস্ত এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাদের কাছে ভগবানের চেয়েও কাম্য এই মনের মানুষ, রসের মানুষ। রসের মানুষের অবস্থান ভূমি বলে তারা মানব দেহের মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। তাদের কাছে দেহ শুধুমাত্র দেহই নয়, তাদের মতে দেহভাণ্ডের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড। ইষ্টসিদ্ধির জন্য মুক্তিকামীর পক্ষে দেব-উপাসনার প্রয়োজন নেই; তীর্থভ্রমণের আবশ্যকতা নেই। মানব দেহের মধ্যেই রয়েছে তীর্থস্থান, পূণ্যভূমি, দেবমন্দির, দেবদেবী সব কিছু।

দেহ সম্পর্কে এমনি ধারণা বাউল ধর্মীরাই প্রথম প্রচার করেননি। একাদশ-দ্বাদশ শতকে সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের গ্রন্থে দেহ মাহাত্ম্য বিশদভাবে আলোচনা করে গেছেন; মধ্যযুগের সন্তরাও বাইরের অনুষ্ঠানগুলো ধর্মাচরণ অপেক্ষা দেহের মধ্যে যে পরমাত্মা রয়েছেন তাঁকে উপলব্ধি করার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বৈষ্ণব আচার্যদের কাছে থেকেও দেহের মাহাত্ম্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস দেহধারী মানুষকে স্বয়ং ভগবানের উপর স্থান দিয়েছেন। সুতরাং বাউলপন্থীরা দেহকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পনা করে তত্ত্বের দিক থেকে অনাবিষ্কৃতপূর্ব কোনো মতবাদ প্রচার করেননি। তান্ত্রিক গ্রন্থেও দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইষ্টসিদ্ধি সম্ভব একথা প্রচারিত হয়েছে। বাউলধর্মীরা দেহের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পূর্বগামী ধর্মগুরুদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গেছেন মাত্র।

সুফী ও বৈষ্ণব ধর্মের কাছ থেকে বাউল সাধকেরা গ্রহণ করেছিলেন ভক্তিবাদের আদর্শ, কিন্তু তান্ত্রিক মতবাদকেও উপেক্ষা করেননি তাঁরা। তান্ত্রিক ধর্মগুরুরা দেহকে যে গুরুত্ব দান করেছিলেন। বাউল ধর্মীরাও সে গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছেন।

তান্ত্রিক সাধকরা দৈহিক যোগাভ্যাসের ফলে ইষ্টসিদ্ধি সম্ভব বলে যে মতবাদ প্রচার করে গেছেন—সে মতবাদ বাউলপন্থীদের কাছে অনুমোদন লাভ করেছে। তাছাড়া তন্ত্রাচার্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাউল ধর্মীরা গুরুবাদের ভিত্তিতে তাদের ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস করেছিলেন।

তান্ত্রিক ধর্মগ্রন্থে যোগক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এইসব গ্রন্থে দেহমধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন চক্রের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী যৌগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করলে—ইষ্টসিদ্ধি সম্ভব একথা তন্ত্রধর্মে সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হয়েছে। বাউল সাধন পদ্ধতিতেও দেহমধ্যস্থিত চক্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইষ্টলাভের সম্ভাবনা আলোচনা প্রসঙ্গে তান্ত্রিক এবং বাউলপন্থী সকলেই দেহকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিশ্বরূপে পরিকল্পনা করেছেন। মানব জন্ম পরিগ্রহ করা দুর্লভ সৌভাগ্য। মানব দেহের মধ্যে আত্মোপলব্ধির সকল উপকরণ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। নরনারীর গভীর প্রেমমিলনের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। মাধুর্যরস উপভোগ নরনারীর মিলন দ্বারাই সম্ভব।

মানব দেহের মধ্যেই পরমাপ্রকৃতি ও পরমপুরুষের মিলন সম্ভব। এই মিলনের উপায়, প্রকৃতি এবং পরিণতি বাউলদের রচনায় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

দেহের মধ্যে পরমপুরুষের মনের মানুষের অবস্থান কল্পনা করে বাউল সাধনার রূপ ও স্বরূপের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। দেহের বাহিরের পরিচয় দেহের রূপ। কিন্তু বাহিরের রূপকে অতিক্রম করে মানব দেহের আরো অতি প্রাকৃত একটি রূপ আছে। সেরূপই স্বরূপ। নরনারীর মিলন যেখানে প্রকৃতি পুরুষের মিলনে পর্যবসিত হয় সেখানে দেহের রূপ অবলম্বন করে মিলন সম্ভব হয়, সার্থক হয় কিন্তু এই মিলনকে সার্থকতর পরিণতির পথে পরিচালিত করতে

হলে রূপলোক থেকে উত্তীর্ণ হয়ে স্বরূপলোকে প্রবেশ করা প্রয়োজন। শরীরের উপলব্ধি যেখানে অনুভূত হয়, সেখানে শুধু-মাত্র প্রকৃতি পুরুষের মিলন হয় না, সেখানে হয় অপ্রাকৃত সহজ-লীলা। বৈষ্ণব সাধকরা এই লীলাকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলারূপ নির্দেশিত করেছেন। বৈষ্ণব এবং বাউল এই উভয় মত অনুসারে স্বরূপের উপলব্ধিতে যে মহামিলনের পরিকল্পনা করা হয়েছে তার মধ্যে ইন্দ্রিয় আকাঙ্খার কোনো স্থান নেই। বৈষ্ণব কবিরা একে নিকষিত হেম আখ্যা দিয়েছেন—আর বাউলরা বলেছেন এ অবস্থা হলো 'জ্যান্তে মরা'। এই অবস্থায় উপনীত হতে হলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট যৌগিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা অপরিহার্য। বাউলদের রচিত বহু গানে কবিতায় এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণব ধর্মে প্রকৃতি পুরুষের এই মিলন কিভাবে রাধাকৃষ্ণের মিলনের মহত্তর সার্থকতার পরিণতি লাভ করতে পারে, সে সম্পর্কে যে সব আলোচনা করা হয়েছে তার সঙ্গে বাউল সাধকদের প্রদর্শিত সাধন-পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার অনেকখানি সাদৃশ লক্ষ্য করা যায়। এই সকল বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে একটি বিষয়ে সংহতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রত্যেকটি মতবাদেই দেহগুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই দেহশুদ্ধি আয়ত্ত করতে হলে যে কয়েকটি প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া আবশ্যক, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বাউল গানে ও কবিতায় স্থানলাভ করেছে। এইসব প্রক্রিয়া একটি সুসংবদ্ধ প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধকের নিষ্ঠার উপরই এই প্রণালীর সাফল্য নির্ভর করে সদ্‌গুরুর নির্দেশের উপর। গুরুর কার্যকারিতা সম্পর্কে বাউল গানে যে সব ইঙ্গিত স্থানলাভ করেছে তার সঙ্গে তান্ত্রিক এবং পৌরাণিক ক্রিয়া বহুল সাধন প্রণালীর সাদৃশ্য সম্পর্কেও ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে ভাব দেহ। কায়ার বন্ধন উত্তীর্ণ হয়ে ইন্দ্রিয় ভোগের সকল বাসনার উর্ধে আরূঢ় হয়ে রূপলোক অতিক্রম করে

স্বরূপে উপগত হয়ে মহামিলনকে সার্থক করে তুলতে পারলেই বাউল সাধনার চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।

বাউল সাধনার যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে যেমন দেহভাণ্ডবাদ, গুরুবাদ, মনের মানুষ সম্পর্কে ধারণা, প্রকৃত প্রকৃতি পুরুষের মিলনের আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে কোনো একটি গ্রন্থে প্রামাণিক আলোচনা স্থানলাভ করেনি—এইসব তত্ত্ব ছড়িয়ে রয়েছে গানে কবিতায়।

বাউল সাধনা সম্পর্কে যে সকল তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে সে সব তত্ত্ব কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থে অথবা কয়েকটি গ্রন্থে এক সঙ্গে আলোচিত হয়নি। এইসব তত্ত্ব ছড়িয়ে রয়েছে বাউলদের রচিত নানা গানে কবিতায়। বাউলদের রচনা-সংগ্রহ কার্যে যারা আত্ম-নিয়োগ করেছেন তারা বাঙ্গালী মাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। এই সংগ্রহ কার্যটি কিরূপ কঠিন দায়িত্বপূর্ণ, সে কথা সংগ্রহকারীরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেছেন। প্রথমতঃ বাউল বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত কোনো স্বতন্ত্র সাহিত্য অথবা সঙ্গীত সঙ্কলিত হয়নি। যারা এই সঙ্কলন কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তারা নানা ধরনের পল্লীসাহিত্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত লোক সঙ্গীত থেকে বাছাই করে তারা যে সব সঙ্গীত কবিতা উদ্ধার করেছেন সেগুলো সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের দিক থেকে পরম রত্ন বলে স্বীকৃত হলেও এদের অসম্পূর্ণতা দূর করা কোনো সংগ্রহীতার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং বাউল সঙ্গীত নামে পরিচিত সঙ্গীত সংগ্রহ থেকে বাউল সাধনা ও ধর্মমত সম্পর্কে একটি পূর্ণাবয়ব ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তবু বাউলদের সম্বন্ধে তাদের গানই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এই সব গান এক-একটি বিশিষ্ট অঞ্চলে বাউল সাধকের সাধনাক্ষেত্র থেকে প্রচারিত হতো। কিন্তু সমগ্র বাংলা দেশ জুড়ে যখন যেখানে এইসব সঙ্গীত প্রচলন লাভ করেছিল তখন সেগুলো একসঙ্গে সংগ্রহ করা হয়নি। বাউল গান সম্পর্কে যাঁর মনে সব চেয়ে আরো অনুসন্ধিৎসা দেখা দিয়েছিল এবং যিনি এ সম্পর্কে

বিদ্বজ্জন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। মোহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংকলিত হারামণি পুস্তকের প্রকাশন উপলক্ষে কবি যে আশীর্বাণী লিখে পাঠিয়েছিলেন তাতে বলেছেন—

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হতো। আমার অনেক গানই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে—এর থেকে বোঝা যাবে—বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে তখন আমার নবীন বয়স। শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কোলকাতায় এক তারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায় সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ বিদেশ বেড়াই ঘুরে।

কথা নিতান্ত সহজ কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটি উপনিষদের ভাষায় শোনা গেছে, তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ—যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটি শুনলুম তাঁর গেঁয়ো সুরে—সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকে সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছেনা যে শিশু, তাঁরই কান্নার সুর তার কণ্ঠে বেজে উঠছে। 'অন্তর তর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন মনের মানুষ বলে শুনলুম—আমার মনে বড় বিস্ময় জেগে ছিল। এর অনেককাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের—অমূল্য সঞ্চয় থেকে এমন

বাউলের গান শুনেছি, ভাষায় সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য রচনা তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোক সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।" রবীন্দ্রনাথ একথাটি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে বাংলার জাতীয় ইতিহাসের লুপ্ত সাহিত্য অধ্যায় আবিষ্কার করতে হলে লোক সাহিত্য বিশেষ করে বাউল সাহিত্যের পুনরুদ্ধার অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের প্রতি যে শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করতেন তা তাঁর একাধিক প্রবন্ধে, পত্রে, গানে প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বাউল শব্দের এবং বাউল দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁরা উভয়েই বাউল তত্ত্ব এবং উপনিষদের উপপাদ্যের মধ্যে আশ্চর্য্য জনক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। খাঁচার ভিতর অচিন পাখীর যাওয়া-আসার মধ্যে তারা সীমার মাঝে অসীমের অস্তিত্ব অনুভব করে ভারতীয় সাধনার মূল তত্ত্বের সঙ্গে বাউল সাধনার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন। এই দেহের ভিতরেই একটি দেহাতীত মনের মানুষের কল্পনার মধ্যে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন উপনিষদের শিক্ষার ইঙ্গিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহন উভয়েই বাউল গান সংগ্রহের গুরুত্বের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বাউলদের সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তা জানার প্রেরণা প্রধানতঃ পেয়েছি এঁদের কাছ থেকেই।

কিন্তু বাউল দর্শন আলোচনা করলে উপনিষদ প্রচারিত শিক্ষার সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে পারলেও বাউল দর্শনের সবদিক এতে ধরা পড়ে না। এর আরো একটি স্থূলতর দিক আছে। সামাজিক এবং ধর্মীয় যে সব সংস্কার এবং প্রথা বহু যুগ থেকে অভিব্যক্তির নানা স্তর অতিক্রম করে জনসমাজে সহজে এবং নির্বিচারে প্রচলন লাভ করেছিল—বাউল সাধনা এবং দর্শন তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। প্রায় প্রতিটি ধর্মমতের অভিব্যক্তি একাধিক

রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। একটি রূপ অন্তরের ঐশ্বর্যে ভরপুর। সেখানে অনুভূতি প্রবল। মননশীলতা এর প্রধান উপজীবিকা—এ শুধু অন্তরকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার সামগ্রী। বাহিরের কোনো রীতি-নীতি অথবা অনুশাসনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এছাড়াও অধিকাংশ ধর্মের আরো একটি রূপ আছে—সেটি বাহিরের রূপ। সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্ম প্রধানতঃ সংস্কারপন্থী এবং আচারপ্রধান হয়ে থাকে। মননশীলতার আবেদন সমাজে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আবদ্ধ। সমাজের সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ধর্মকে যে দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হয়ে গ্রহণ করেন, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী তা থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণ লোক ধর্মকে অভীষ্ট বলে তত মনে করেন না, যত মনে করেন অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় বলে। অন্তরের অনুভূতি অপেক্ষা বাহিরের কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলাই তাঁরা ধর্মলাভের সহজ উপায় বলে মনে করেন। এই কারণে পৃথিবীর সকল দেশে সকল যুগেই ধর্মকে দুটি রূপ পরিগ্রহ করতে দেখা যায়। বাউল ধর্মের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তাই একদিকে বাউল সঙ্গীতের মধ্যে যেমন দেখা যায় ভারতীয় সাধনার মূল সুর, অপরদিকে তেমনি বাউল মতবাদের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রচেষ্টাও দেখা যায়। ব্যক্তিগত মননশীলতা দ্বারা যেখানে ধর্ম প্রভাবিত হয়, সেখানে ধর্ম স্বাধীন বাধাহীন। কিন্তু এই ধরনের ধর্ম অধিগত করার যোগ্যতা সকলের নেই। এই কারণেই সহজতর এবং অধিকাংশের গ্রহণোপযোগী একটি ধর্মমতের প্রয়োজন অনুভূত হয়ে থাকে। সাধারণের মধ্যে বেশীর ভাগ আচার-বহুল ধর্মমত নির্বিবাদে গৃহীত হতে দেখা যায়। উপনিষদে যে ধর্মমত প্রচারিত হয়েছিল তা অনুধাবন করার মতো মানসিক চেতনা তাদের ছিল না, তারা নিজেদের প্রয়োজনে আচার-বহুল ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেই ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে গ্রহণ করলেন। তাই যাগযজ্ঞ-মন্ত্রতন্ত্র হয়ে দাঁড়ালো ধর্মের প্রধান অঙ্গ। তারপরে এলো পুরোহিত-তন্ত্র এবং ক্রমে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো

যে, কেবলমাত্র নির্ধারিত কয়েকটি বিশেষ তিথিতে শাস্ত্র-নির্দেশিত কয়েকটি অনুষ্ঠান পালন করলেই ধর্মাচরণ করা হবে। এইভাবে সমাজে পুরোহিত-শ্রেণীর প্রাধান্য স্থায়িত্ব লাভ করলো। বেদ-বেদান্তে যে ধর্মমত প্রচারিত হয়েছিল, তার সঙ্গে সাধারণ লোকের যোগসূত্র ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। এইভাবে সমাজে প্রাধান্য লাভ করলো আচার-বহুল ধর্মীয় প্রথা। উপনিষদ্‌-প্রচারিত ধর্ম যেভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল তেমনি রূপান্তর ঘটেছিল ব্রাহ্মণ্যেতর অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও। বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করলে এমনিভাবে বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটেছিল—এই তথ্যই প্রমাণিত হয় ও অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও এমনি অভাবনীয় কিন্তু অনিবার্যপ্রায় পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। কোনো প্রথম প্রচারিত ধর্মের পিছনে যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রচ্ছন্ন থাকে, সেটি যখন সর্বসাধারণের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করে তখন সেই পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী নিজের বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তা অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। গৌতম বুদ্ধ মৃগদাবে যে সহজ সরল ধর্মমত প্রচার করেছিলেন, সেটি স্বাভাবিকভাবে বহু নরনারীর অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিন্তু কাল-ক্রমে যখন সেই ধর্মমত সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আপন প্রাধান্য স্থাপন করলো, তারপরেও যখন মৌর্য রাষ্ট্রশক্তির অকৃপণ সহায়তা পেয়ে ভারতবর্ষের বাহিরেও দেশ-দেশান্তরে এই ধর্মমতটি প্রচারিত হল, তখন থেকেই এর মধ্যে প্রাচীন বুদ্ধ-প্রচারিত মতের সহজ সরল চেহারাটি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারও পরে যখন বৌদ্ধ ধর্ম বিবিধ শাস্ত্রের অনুশাসনে কণ্টকিত হয়ে উঠলো, তখন তথ্য ও তত্ত্বের অরণ্যে প্রাচীন ধর্মমতের সহজ সরল আবেদন নিজেকে হারিয়ে ফেললো। শুধু বিভিন্ন দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হওয়ার ফলে বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছিল তা বলা যায় না। এই ধর্মমতটি যদি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতো, তাহলেও এটি স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত হয়ে উঠতো। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে এ

অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের মতো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ভারতের বাহিরে বহুল প্রচারিত হয়নি—তাহলেও বৌদ্ধ ধর্মের মতো ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও রূপান্তর ঘটতে দেখা গেছে। বাউল ধর্মের ক্ষেত্রেও এ চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম যখন এই ধর্মমতটি প্রচারলাভ করেছিল, তখন যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি অনুষ্ঠান-বাহুল্য বর্জন করে সহজ সরলভাবে একটি মনের মানুষের আবিষ্কৃতি-টিকেই ধর্মাচরণের প্রধানতম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারপর সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণেই হোক, কিংবা অন্যান্য ধর্মের প্রভাবের ফলেই হোক, এই ধর্মমত ও সাধন-প্রণালীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল বিস্ময়কর পরিবর্তন। হয়তো বাউল ধর্ম ও দর্শনের আবেদন জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকতরভাবে প্রচার করার চেষ্টার মধ্যেই এই পরিবর্তনের বীজ আত্মগোপন করে ছিল। যা ভাবতে সহজ তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে করা সহজসাধ্য নয়। উপনিষদের বাণী এবং প্রথম প্রচারিত বাউল ধর্মের শিক্ষা নিঃসন্দেহে সহজ সরল। কিন্তু সাধারণ মানুষ যা সহজ সরল সেদিকে সহজে আকৃষ্ট হয় না। যেখানে ধর্মের মূলতত্ত্বটি অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, সেখানে সাধারণ শ্রেণীর নরনারীর কৌতূহল সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয় না। অকপট সত্যের নিরাবরণ প্রকাশ মানুষ সহজে গ্রহণ করতে চায় না। যে সত্য খানিকটা রহস্যজালে আকীর্ণ রয়েছে, যেখানে যুক্তির আলোতে দিবালোকের মতো সব-কিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সংশয় বা রহস্যের স্থান যেখানে নেই, সেই সব তত্ত্ব ও তথ্য জনচিত্তে কোনো গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না। যে পথ সরল, যার শেষ স্বচ্ছ দৃষ্টির কাছে সহজেই ধরা পড়ে—তার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক কোনো আকর্ষণ নেই। যে পথ যত দুরূহ, যত বিপদ-কণ্টকিত, সে পথ তত বেশী আকর্ষণ করে মানুষের মন। মানুষের মধ্যে অজানা বিপদ বরণ করার প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। তাছাড়া মানুষের মনে এরকম একটি প্রচ্ছন্ন ধারণাও রয়েছে যে, কতকগুলো বিষয়ে শারীরিক নিপীড়ন এবং সেই সঙ্গে মানসিক কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়। এমন লোকের সংখ্যাও নগণ্য নয়—যাদের কাছে মানসিক কৃচ্ছ্রসাধনের চেয়েও শারীরিক ক্লেশ বরণের গুরুত্ব বেশী। কতকগুলি মূল নিয়ম-পদ্ধতির বাহিরের আচার-আচরণ তাদের কাছে ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। দেহের ভিতর দেহাতীতের সত্তা উপলব্ধি করার উপযোগী মানসিক সম্পদ যাদের নেই, তারা কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী মেনে চললে ধর্মজীবনে সার্থকতা লাভ করবে—এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠলো। এদের প্রভাব অনতিকাল মধ্যে বাউল সাধনার ক্ষেত্রে অনুভূত হলো। বাউলপন্থীদের মধ্যে ক্রমে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভূত হলো যে, কতকগুলো গোপন যৌগিক প্রণালীর রহস্য-পথে ধর্মের আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব হবে। ফলে বাউল ধর্ম-সাধনার অঙ্গীভূত হলো গূঢ় যোগক্রিয়া। গুরু বা জ্ঞানের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হলো সাধন-প্রক্রিয়ার প্রাধান্য। কিন্তু নূতন ধর্মমত গৃহীত হলেও পুরাতন মতবাদ পরিত্যক্ত হলো না। পাশাপাশি দুটি মতবাদই দীর্ঘকাল ধরে বাউল দর্শন ও সাধনার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করে এসেছে। একই সঙ্গীত-রচয়িতার রচনায় এই দুটি স্বতন্ত্র মতবাদের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বনামধন্য বাউল সাধক লালন শাহ ফকিরের যে গীতিকা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এই দুটি মনোভাবের সুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। দেহের মধ্যে রয়েছে মনের মানুষ, দেহ-মন্দিরের অন্তরতম সত্তা। এই সত্তাকে বাউল সাধকেরা আত্মা বলে কল্পনা করেছেন আর এই আত্মাকে মানবরূপী কল্পনা করে তাকে 'মনের মানুষ', 'রসের মানুষ','ভাবের মানুষ', 'সোনার মানুষ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা একথাও উপলব্ধি করেছেন যে সাধারণ মানুষ অন্তরতম এই সত্তাকে সহজে উপলব্ধি করতে চায় না—নিজের মধ্যে এই সত্তাকে আবিষ্কার করার প্রতি প্রবণতা তার নেই। নিজেকে যে নিজে চিনতে পারে না—তাকে খুঁজে বেড়ায় বাইরে। এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে লালনের একটি সঙ্গীতে—

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে তারে
বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে কে পায়
তেমনি সে থাকে সদায়
আছে আলোকে বসে।
অচিন্ দেশে বসতি ঘর
দ্বি-দল পদ্মে বারাম তার,
দল নিরূপণ হবে যাহার
ও সে দেখবি অনায়াসে।
আমার হলো কি ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে॥

মানুষের দেহ-মন্দিরের মধ্যেই দেবতা বাস করেন। অন্তরের অন্তরতম সত্তাকে উপলব্ধি করতে হলে তীর্থ পর্যটন কিংবা কৃচ্ছ্র সাধন কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই—এই কথাটিও বাউল সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

কাশী কি মক্কায় যাবি যে মন চলরে যাই
দোটানাতে ঘুরলে পথে সন্ধ্যে বেলায় উপায় নাই।
মক্কাতে ধাক্কা খেয়ে
যেতে চাও কাশী স্থানে
এমনি জালে কাল কাটালে
ঠিক না মানে কোথা ভাই।
নৈবিদ্য পাকা কলা
দেখে মন ভোলে ভোলা

সিন্নি বেলায় দরগাতলা
তাও দেখে মন খলবলায়।
চুল পেকে হলে বুড়োহুড়ো
না পেলে পথের মুড়ো
লালন বলে, সন্ধি জেনে
না পেলে জল নদীর ঠাঁই।

কিন্তু যে সাধক মানুষের মধ্যে মনের মানুষের সন্ধান পেয়েছে, যার কাছে আত্মোপলব্ধি চরম লক্ষ্য বলে প্রতিভাত হয়েছে, কৃচ্ছ্র-সাধন কিংবা তীর্থ-পরিক্রমার দূরত্ব যিনি স্বীকার করেননি তিনিও বিশেষ একটি সাধন-প্রণালীর অবলম্বন ছাড়া অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়—এ সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করেছেন। দেহের রূপ এবং দেহ-মধ্যস্থিত আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে গুরুর নির্দেশ এবং বিশিষ্ট একটি সাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করার উপায় হচ্ছে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন। বিশেষ কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রণালী মেনে নিয়ে পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের মধ্য দিয়ে অন্তরতম চিৎ-সত্তার উপলব্ধি সম্ভব—এ-কথাই বলা হয়েছে নীচের গানের লাইন ক'টিতে—

কে বোঝে সাঁইর লীলা খেলা
ও সে আপনি হয় গুরু আপনি চেলা।
সপ্ত-তালার উপরে সে
নিরূপ রয় অচিন্ দেশে
প্রকাশ্য রূপ লীলা রসে
চেনা যায় না সে তো বেদের খোলা।
অঙ্গের অবয়বে সৃষ্টি
করিল সে পরম-ইষ্টি,
তবে কেন আকার নাস্তি
বলে না সেই ভেদ নিরালা।

ধর্মলাভের সোপান হিসাবে যৌগিক ক্রিয়ার কার্যকারিতা পৃথিবীর একাধিক ধর্মমতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে

যে সব বিভিন্ন ধর্মমত প্রচারিত হয়েছিল, তাদের সব ক'টি না হলেও অনেকগুলোতে নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে কতকগুলো সাধন-প্রণালী অনুসরণ করে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাউল ধর্মেও এমনি ধরনের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট সাধন-প্রণালীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রচারিত বাউল ধর্মে এই সব আচার যজ্ঞ, সাধন-প্রণালী হয়তো একেবারেই ছিল না কিংবা থাকলেও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ছিল তার স্থান—কিন্তু তারপর কতকগুলো কারণে —বিশেষ করে সমসাময়িক যুগে অন্যান্য ধর্মের প্রভাবে বাউল মতে অনুপ্রবিষ্ট হলো সাধন-প্রণালীর ব্যাপকতর প্রয়োগ-বিধি।

পৃথিবীর সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই সাধন-প্রণালীর নির্দেশ একটি অপরিহার্য অঙ্গহিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে আলোচনা করলে, সকল ধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয়ী ভাবধারা লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু ধর্মের ব্যবহারিক দিক লক্ষ্য করলে সেখানে দেখা যাবে, বিভিন্ন এবং বহুক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী অনু-শাসনের আতিশয্য। এক-একটি ধর্ম অবলম্বন করে এক-এক প্রকারের সাধন-প্রণালী গড়ে উঠেছে। ধর্মের মর্মস্থলে পৌছবার জন্য এই সব সাধারণ প্রণালী রচিত হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল যে, কতক বিষয়ে এই সব প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলেও এদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতারও অভাব নেই। তাই বলা হয়—যত মত তত পথ। বিরোধের মধ্যে যাঁরা ঐক্যের সন্ধান পাওয়ার উপযোগী উদার এবং বিশ্লেষণক্ষম দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী—তাঁরা মত এবং পথের বাহুল্যে উদ্‌ভ্রান্ত হন না; কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর নরনারী স্বভাবতঃই মত ও পথের বিভিন্নতার দ্বারা হতচকিত হতে বাধ্য। তখন অনিবার্যভাবে প্রশ্ন ওঠে 'কস্মৈ দেবায়'? কোন্ পথ কোন্ মত?—এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ধর্মের আচার্যেরা। আর তার ফলে আসল প্রশ্নের উত্তর পাবার পরিবর্তে সমস্যার জটিলতাই বৃদ্ধি পেয়েছে বেশী। অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের আপেক্ষিক মূল্য সম্পর্কে আলোচনা বিভিন্ন

ধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় আচার্যদের মধ্যে আশা করা যায় না। তাঁরা স্বভাবতঃই তাঁদের নিজ নিজ ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। তাঁরা বিভিন্ন ধর্মপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু আলোচনার শেষে তাঁরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে চেয়েছেন যে, অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মপ্রণালী অপেক্ষা তাঁদের আচরিত ধর্ম এবং ধর্মপ্রণালী শ্রেষ্ঠতর। ধর্মের সঙ্গে ধর্মপ্রণালীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ; তাই ধর্মশাস্ত্রে ধর্মের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে সাধন-প্রণালীর ব্যাখ্যার প্রতিও গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রেই এই নিয়মের অনুসরণ দেখতে পাওয়া যাবে।

ধর্ম ও সাধন-প্রণালীর সম্পর্ক যেখানে অবিচ্ছেদ্য, সেখানে সাধন-প্রণালীর ব্যাখ্যা যেমন অপরিহার্য তেমনি অপরিহার্য অন্যান্য ধর্মের সাধন-প্রণালীর তুলনামূলক আলোচনা। প্রায় সকল ধর্মের ক্ষেত্রে এই আলোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ধর্মাচার্যরা। বাউল ধর্মের সঙ্গেও সাধন-প্রণালীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু অন্যান্য ধর্মকে আশ্রয় করে যেমন বিপুলায়তন ধর্মশাস্ত্র, ভাষ্য, ব্যাখ্যা গড়ে উঠেছে—বাউল ধর্মের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সেখানে ধর্মাচার্যদের স্থান গ্রহণ করেছেন বাউল সঙ্গীত-রচয়িতারা। তাঁদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বাউল সাধন-প্রণালী সম্পর্কে যেমন বিভিন্ন ইঙ্গিতের পরিচয় পাওয়া যায়—তেমনি এই সব সঙ্গীতের মধ্যে—ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রয়েছে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী সম্পর্কে আপেক্ষিক আলোচনা। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—ধর্মাচার্যরা যখন কোনো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন সেই আলোচনার ক্ষেত্র সাধারণতঃ অপ্রশস্ত হয় না। যতখানি পরিসর ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন ততখানি স্থান তাঁরা সংগ্রহ করে নেন। দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁদের বক্তব্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য করে তোলেন। কিন্তু যে সাধন-প্রণালী নিয়ে কোনো গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা হয়নি, যে মতবাদ নিয়ে কোনো ভাষ্য অথবা টীকা রচিত হয়নি, সেই ধর্ম ও সাধন-প্রণালীর দুর্জ্ঞেয়তা দূর করা সহজসাধ্য নয়।

বাউল মতবাদ তাই যে দার্শনিক তত্ত্ব ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ বা বিশদ ব্যাখ্যা কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু বাউল গানের ভিতর বাউল মতবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট যে সব ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতিকালে বিভিন্ন উৎসাহী সাহিত্যামোদী বিদ্বজ্জনের চেষ্টায় বাউল গানের একাধিক সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। এই সব গান একই সময়ে অথবা একই সাধকের রচনা নয়—সুতরাং অনেক সময় এদের মধ্যে পারম্পর্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে একাধিক ক্ষেত্রে এই সব গানের মধ্যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে অসঙ্গতি ধরা পড়বে, কিন্তু সে অসঙ্গতি বাহ্যিক। অন্তরের দিক থেকে একটি সুষম ঐক্য বাউল চিন্তাধারা ও দর্শনের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে—এ তত্ত্বটিও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই গভীর ঐক্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর গতি ধর্মের মূলতত্ত্বের প্রতি নিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু ধর্ম যেখানে বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র, সেখানে ধর্ম নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী মতের অবতারণা অনিবার্যরূপে দেখা যায়। বাউল সঙ্গীতের সংগ্রহের মধ্যেও এমনি সব গানের নমুনা পাওয়া যায়, যাতে ধর্মের মৌলিক তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে অনুষ্ঠান-বাহুল্যের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা প্রায় অনিবার্য। কিন্তু সেখানে ধর্মের তত্ত্ব যে গুহায় নিহিত রয়েছে, সেই গুহার প্রান্তদেশ অবধি—যেখানে দৃষ্টির সন্ধানী আলোকপাতে উদ্ভাসিত—সেইখানে মতবিরোধের স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ যে বাউলের কথা তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন—সেই বাউল মানবিকতার আদর্শ। তাঁর চিন্তায়, মননে, দর্শনে বিরোধের কোন স্থান নেই—সে সংসারের সুখ-দুঃখের প্রতি একেবারে নির্বিকার। সে সমস্ত অন্তর দিয়ে শুধু কামনা করে আপন প্রেমাস্পদকে। সে ফলাকাঙ্ক্ষী নয়। সে শুধু প্রেমের উপাসক ; সৌন্দর্যের পূজারী। তার মনে নেই স্বর্গলাভের কোনো আকাঙ্ক্ষা—সে পুণ্যের প্রতি লোভাতুর নয়।

সে চায় শুধু আনন্দ, অহেতুক আনন্দ। তার এই মনের ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে একটি সুন্দর গানের মাধ্যমে।

হেতু সম্বন্ধ নাইরে তার
করেনি হেতু প্রেম বেচাকেনা।
ফলের আশা করে না সে
ফুলের মধু পান করে সে
সেই তো রসিক জনা।

এই বাউল রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বাউলের যে ছবি ভেসে উঠেছিল তারই প্রতিনিধি। কিন্তু অহেতুক আনন্দ লাভ যার জীবনের আকাঙ্ক্ষা, তার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। সেই পথের সন্ধান যিনি দিতে পারেন তিনিই গুরু। বাউল সাধনার ক্ষেত্রে অনেকখানি পরিসর জুড়ে অবস্থান করছেন গুরু যিনি সহজলভ্য নন অথচ যাঁকে ছাড়া জীবন অর্থহীন ; যাঁর অস্তিত্বের অনুভূতি ছাড়া জীবন হয়ে পড়ে অর্থশূন্য তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে, তবু যাঁকে পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই সেই অ-ধরাকে ধরিয়ে দিতে পারেন একমাত্র গুরু। গুরুর ভূমিকার গুরুত্ব যে গানটিতে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার প্রথম ক'টি লাইন—

ধরবি যদি অধর মানুষ—
ধরাকে ধররে মন।
মন ফুলে নয়ন জলে
পূজগ্যা গুরুর শ্রীচরণ।
....
গুরুপদে নিষ্ঠা করে থাকরে মন চাতক হয়ে
নবঘন জল বারি লয়ে—
তবে দেখতে পাবি তেমন।

মধ্যযুগের একাধিক ধর্ম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর কারণ সুস্পষ্ট। এই সব ধর্মে যে সব আচার-অনুষ্ঠানের

উপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো—যেগুলো এমন জটিল যে বহুশ্রুত অভিজ্ঞ কোনো গুরুর নির্দেশ ছাড়া তা মেনে চলা কঠিন ছিল। তাছাড়া এই যুগের ধর্ম যে সব সাধন-প্রণালী অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল, সেগুলো ছিল রীতিমত জটিল আর সযত্নে সে সাধন-প্রণালীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার চেষ্টা করা হত। গূঢ় এবং জটিল এই সব সাধন-প্রণালী ব্যাখ্যা করার জন্যও প্রয়োজন ছিল গুরু। তাছাড়া সাধারণ শ্রেণীর সাধকের মনে এ ধারণা ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে, গুরুর কৃপা এবং নির্দেশ ছাড়া সাধন-পথে কেউ শেষ পর্যন্ত অভীষ্টে পৌঁছতে পারে না। বাউলপন্থী লালন ফকিরের একটি গানে এই ভাবটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার নেও সুপথে,
তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধবো কি মতে।
তুমি যারে হও গো সদয়
সে তোমারে সাধনে পায়
বিবাদী তার স্ব-বশে রয়
তোমার কৃপাতে।
অন্তরেতে যন্ত্রী যেমন
যে মত বাজায় বাজে তেমন,
তেমনি যন্ত্র আমার মন
বোল তোমার হাতে।—
জগাই মাধাই দোষী ছিল
তারে গুরুর কৃপা হ'ল
অধীন লালন দোহাই দিল
সেই আশাতে।

গুরুকে শুধু অসাধারণ মানুষ কিংবা মহাপুরুষ বলে কল্পনা করে বাউল সাধকরা নিশ্চেষ্ট হননি—গুরুকে তাঁরা অবতার এমন কি স্বয়ং বিধাতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতেও ইতস্ততঃ করেননি। লালন আর একটি গানের কলিতে বলেছেন—

"গুরুকে যে মনুষ্য জানে, তার অধোগতি নরকে স্থান
লালন বলে তাই ভাবিরে, এমনি যেন না ঘটে;
মন রে আমায় স্বভাব দোষে।"

বাউল সাধনার মূলে রয়েছে গুহ্য সাধন-প্রণালী। ষট্‌চক্রের সাহায্যে আত্মশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলাই এ সাধনার উদ্দেশ্য। শরীরের মধ্যে শক্তির আধার কুলকুণ্ডলিনী। এ-কে জাগ্রত করতে পারলে পাওয়া যায় অপরিসীম আনন্দ। কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার যে সব উপায় তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দেশিত করা হয়েছে, তা অত্যন্ত জটিল। কোনো একটি স্বল্প-পরিসর আলোচনার সাহায্যে এই প্রণালীর ব্যাখ্যা চলে না—তা সত্ত্বেও কোনো কোনো বাউল সঙ্গীতে তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গের উল্লেখ করা হয়েছে।

বাউল সাধন-প্রণালীতে যে সব প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে সেগুলো গুরুর সাহায্য নিয়ে যথাযথভাবে পালন করলে সাধক অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবেন—এমনি ধরনের ইঙ্গিত বাউলদের রচনায় পাওয়া যায়।

"অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র যে করে উদয়।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে—তিন ধামেতে
হবে জয়;
সামান্যের কর্ম নয়, সাধনে সিদ্ধ হয়।"

কিন্তু বাউল সাধনায় যোগ-প্রক্রিয়া সাধনের যেমন স্থান আছে, তেমনি স্থান আছে আত্মসমর্পণ ভাবের—যেখানে বাইরের কোন বিশিষ্ট সাধন-পদ্ধতি মেনে চলার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু দেহ-মন সব-কিছু ইষ্টের কাছে সমর্পণ করে দেওয়া; এইখানে বাউল সাধনার উপর ভক্তিবাদের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব-সাধনার মতো বাউল সাধনাও প্রেমমূলক সাধনা।

বাউল গানের মধ্যেও নিকষিত হেম মূর্তি আলোচনা রয়েছে। লালনের একটি গানে প্রেম-আশ্রয়ী ভক্তিবাদের সুস্পষ্ট এবং সুন্দর ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়।

শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে আর পায়,
ও যে না মানে আচার না মানে বিচার,
প্রেমের রসে রসিক সে দয়াময়।
জানে না মন, শুষ্ক কাষ্ঠে
কবে তার মালঞ্চ ফোটে,
অমনি প্রেম নাই যার, অমনি কষ্টে
সে নিজ সুখ সাধনা বলিদান দেয়।
সে প্রেমের প্রেমী যারা,
ফণী যেন মণি হারা,
দেখলে তার মুখ
হৃদয়ে বাড়ে সুখ,
আমার দয়াল চাঁদ
তাহার থাকে সদয়।
যোগেন্দ্র মণীন্দ্র আদি,
যোগ সেধে না পায় যে নিধি,
প্রেম দিয়ে আর বাধলে গোপীরে
লালন বলে, সে প্রেম কী ঘটবে আমার।

বৈষ্ণব মার্গে যে শুদ্ধ প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, তার প্রতিধ্বনি বাউল রচনার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব আদর্শ অনুসারে প্রেমের পূর্ণতম অভিব্যক্তি ঘটেছিল শ্রীরাধার জীবনে।

রজকিনী প্রেমের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষতঃ কাব্যে যে পরকীয়া প্রেম বর্ণিত রয়েছে তার প্রতিধ্বনিও বাউল সঙ্গীতে পাওয়া যায়। সেখানে সাধনমার্গের ক্রিয়া-কলাপের জটিলতা নেই, আছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণের কথা, প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তন।

পীরিতি অমূল্য নিধি
বিশেষ বিশ্বাস মতে কারো হয় যদি
এক পীরিতি শক্তিপদে
মজেছিল চণ্ডী চাঁদে

জানলে সে ভাব মনকে বেঁধে
ঘুচে যেতো কণ্ঠের বিবাদী।
এক পীরিতি ভবানীর সনে
মজেছিল পঞ্চাননে
রহিল ত্রিভুবনে কিঞ্চিৎ ধ্যানে
মহাদেব সিদ্ধি।
এক পীরিতি রাধার অঙ্গ
পরশিয়ে শ্যাম গৌরাঙ্গ
কর লালন এমনি সন্ধ
কহে সিরাজ সাঁই নিরবধি।

বিশুদ্ধ প্রেম অবলম্বন করে তারই সাহায্যে সাধনার পথে সিদ্ধিলাভের যে ইঙ্গিত বাউল সঙ্গীতে পাওয়া যায়, সেখানে শুদ্ধমাত্র অন্তরের ভক্তি এবং আন্তরিক প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। যে সাধক প্রেমের তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন, বাহিরের কোন ক্রিয়াকলাপ এবং তীর্থদর্শনের তাঁর কোনো আবশ্যক নেই। কিন্তু প্রেম-সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজন সদ্‌গুরু লাভ। তাঁরই নির্দেশে আত্মশুদ্ধির সাহায্যে সাধনার ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব—এই ইঙ্গিতটি একটি সঙ্গীতে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

মন তোর দেহের ভাবনা কেনো ?
গুরুর নাম লয়ে তুই বস্ ধিয়ানে,
গাঁটের টাকা খরচ করে
কেনো গেলি তুই গঙ্গাস্নানে ?
তোর গয়া কাশী শ্রীবৃন্দাবন
সব র'ল তোর গুরুর চরণে।
উট দুম্বা ছাগল ভেড়ী,
কাজ কিরে তোর বলিদানে
আপন দেহের মধ্যে ছয়টি পাঁটা
কুরবানী দাও গুরুর চরণে।

ঢাক ঢোলক সারিন্দা বেহালা

গুরুর কাছে সেবা দানে,

আপন দেহকে সারিন্দা বা'নে

বাজাও যন্ত্র রাত্র দিনে।

তীর্থভ্রমণ, যাগযজ্ঞ, বলিদান—এ-সবের প্রয়োজন বাউল সাধনায় স্বীকৃত না হলেও বাউল সঙ্গীতের মধ্যে সাধনার যে পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে, সে সাধনার ত্যাগ তিতিক্ষা, তপস্যার গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে। মন্দিরে মসজিদে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে ইষ্ট-লাভের সম্ভাবনা. বাউল সাধকরা স্বীকার করেননি—কিন্তু তাঁরা ইষ্টলাভের উপযোগী যে পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন তাতে বাহিরের কিংবা দূরের কোনো ভগবানের অস্তিত্ব আলোচিত হয়নি। সেখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে মানুষের অন্তরস্থিত 'অধরা মানুষের' উপর। কিন্তু অন্তরের অন্তরস্থিত এই মানুষটির আবিষ্কার-সাধনা দুর্গম সাধনা। তাই বাউল সাধক বলেছেন—

আপনারে আপনি চিনি নে।

দীন দ'নের পর যার নাম অধর

তারে চিনবো কেমনে।

আপনারে চিনতাম যদি

হাতে মিলতো অটল নিধি

মানুষের করণ হতে সিদ্ধি

শুনি আগম পুরাণে

কর্তারূপের নাই অন্বেষণে

আত্মারি কি হয় নিরূপণ

আত্মতত্ত্বে পায় সাধ্য ধন

সহজ সাধক জনে।

দিব্যজ্ঞানী যে জন হলো

নিজতত্ত্বে নিরঞ্জন পেলো

দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন রইল
জন্ম অন্ধ মন গুণে।

এই অধরা মানুষটিকে বর্ণনা করা হয়েছে সাঁই বলে—কিন্তু যেরূপে সাঁই আছে মানুষে—

রসের রসিক না হলে কি পাবে তার দিশে।

দেহের মধ্যে যাঁর অবস্থান তাকে পাওয়া মোটেই সহজসাধ্য নয় কাছে থেকেও। তিনি রয়েছেন অনেক দূরে—প্রায় নাগালের বাইরের এই মানুষটি। কাছে থেকেও যিনি দূরে তাঁকে পাওয়া সহজ না হলেও অসম্ভব নয়। তার জন্য চাই আত্মশুদ্ধি। দেহের মধ্যে যেমন রয়েছে শুভবুদ্ধি, তেমনি আছে দুরন্ত রিপু। একদিকে জ্ঞান, বিবেক, সংযম, বৈরাগ্য ও ভক্তি, অন্যদিকে রয়েছে পাঁচটি জ্ঞান ইন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আর ছটি রিপু। এদের মধ্যে চলছে অহর্নিশি সংগ্রাম, কিন্তু এই সংগ্রামে যাঁরা জয়লাভ করবেন—তাঁরাই পাবেন মনের মানুষের সন্ধান।

শহরে ষোল জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি
চোরেরও সে শিরোমণি
নালিশ করবো আমি
কোনখানে কার নিকটে।
পাঁচজনা ধনী ছিল
তারা সব ফতুর হলো
কারবারে ভঙ্গ দিল
কখন যেন যায় উঠে।
গেল ধন মান আমার
খালি ঘর দেখি জমার
লালন কয় খাজনার দায়
কখন যেন যায় লাটে॥

মানুষের জীবনের পরিমাপ নির্দিষ্ট। জন্ম থেকে মৃত্যু এই পথ দিয়ে যে জীবনের গতি প্রসারিত হয়ে থাকে তার আয়ুষ্কাল সুনির্দিষ্ট এবং পরিমিত। অথচ মানবজন্ম সুদুর্লভ তাই শক্তি-সাধক কবির মত বাউল-পন্থীরাও বলেছেন এমন মানুষ-জন্ম বিফল গেল।

কোনদিন আসবে শমনের চেলা
ভেঙে যাবে ভবের খেলা
সেদিন হিসাব দিতে বিষম জ্বালা
ঘটবে শেষে।

এই জ্বালা থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় রয়েছে মানুষের নিজের কাছে। সংসার জীবনের প্রলোভন এবং কৌটিল্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার প্রয়াস করা মনুষ্য দেহধারী প্রত্যেক জীবেরই কর্তব্য। তাকে উপলব্ধি করতে হবে দেহের গভীরে যে বিরাট সত্ত্বা আত্ম-গোপন করে রয়েছে তাঁকে। এই সত্ত্বাই হলো মনের মানুষ। যে দেহের মধ্যে মনের মানুষের অবস্থান সে দেহ মন্দির ছাড়া কিছু নয়। দেহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বাউল সঙ্গীতে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

দেহ শুধু রক্ত-মাংস নিয়ে গঠিত হয়নি—এই দেহের আরো একটি গভীরতর পরিচয় রয়েছে। এই দেহের মধ্যেই বিরাজ করেন অচীন পুরুষ সুতরাং দেহ পবিত্র দেবস্থান। মাত্র সাড়ে তিন হাত এর পরিধি কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে অনন্ত শক্তির আধার।

ঘরের মাপ চোদ্দ পোয়া
চোদ্দ ভুবন তার ভিতরে।

দেহ-মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতনতা শুধু বাউল সাধন পদ্ধতির বৈশিষ্টই নয় মধ্যযুগে বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, সহজিয়া, বৈষ্ণব, সুফী, নাথ, যোগী প্রভৃতি যে সব ধর্মমতের প্রচলন হয়েছিল তাদের সব কটিতেই দেহের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো শাস্ত্রে একথাও বলা হয়েছে যে দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে সব দ্রব্যই বর্তমান রয়েছে। আকাশ, বাতাস, জল, আগুন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সব কিছুই এ দেহ-মন্দিরে অবস্থিত রয়েছে। পুরাণে দেহের

ভিতর অবস্থানকারী সপ্তদ্বীপের এবং সপ্তসাগরের অবস্থিতি নির্দেশিত হয়েছে। দেহের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত এই চিন্তাধারা থেকেই দেহ-চক্রের পরিকল্পনা উদ্ভূত বলে মনে হয়। তন্ত্রমতে দেহ মধ্যে ছয়টি চক্র ও পদ্ম এবং কতকগুলো নাড়ীর কল্পনা করা হয়েছে। বাউল সাধকদের মতে পরম তত্ত্ব বা সাঁই সহস্রদল পদ্মে বিরাজ করছেন, তাঁকে পাবার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট সাধন প্রণালী অবলম্বন। লালন ফকিরের একাধিক গানে এই ভাবটির অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

বল কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা দেশ-বিদেশে
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনায়াসে।
দড়দড়ি দিল্লী লাহোর
আপনার কোলে রয় ঘোর।
নিরূপ আলেক সাঁই মোর
আত্মারূপ সে।
যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডের পর
সেই লীলা ভাণ্ড মাঝার
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার
মেঘের পাশে।
আপনাকে আপনি চেনা
সেই বটে উপাসনা
লালন কয় আলেক চেনা।
হয় তার দিকে

আত্মোপলব্ধির সাহায্যে পায়াও যায় সহস্র পদ্মদলে বিরাজমান সেই অধরা অচীন মানুষটিকে। বর্ণনাও একাধিক বাউল গানে তাঁর আছে।

সোনার মানুষ ভাসছে রসে,
যে জেনেছে রসশান্তি সেই
দেখতে পায় অনায়াসে।

তিনশো ষাট রসের নদী,
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি,
তার মাঝে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।

বাউল-দর্শন মতে মানুষ বা স্বরূপ তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। মানুষকে জানা আর নিজেকে জানা একই। নিজেকে যিনি জানতে পারেন তিনি অপর কোনো তত্ত্বে আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। মানুষ রতনটিকে যিনি চিনেছেন তিনি আত্মোপলব্ধির কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বলা যেতে পারে। তার কাছে সাধন পূজন দেব-দেবীর আরাধনা তখন মনে হয় অর্থহীন।

মানুষ-তত্ত্ব যা সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।
মাটির ঢিবি, কাঠের ছবি
ভূত ভাবি সব দেব আর দেবী
ভোলে না সে এ সব রূপী
ওযে মানুষ রতন চেনে॥
জিন্ ফেরেস্তার খেলা
পেঁচো পেঁচি আলা ভোলা—
তার নয়ন হয় না ভোলা,
(ও যে) মানুষ ভজে দিব্য জ্ঞানে।
ফেও ফেঁপি ফেকসা যারা
ভাকা ভুকোয় ভোলে তারা।
লালন তেমনি চটা মারা
ও ঠিক দাঁড়ায় না একখানে।

আত্মোপলব্ধির এই সাধনা কঠিন সাধনা—এতে বহু দেবদেবীর স্থান নেই কিন্তু এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে চাই একাগ্রতা। একাগ্রতার সাধনাও সুকঠিন। এতে সিদ্ধিলাভ করতে হলে একদিকে চাই বহুদর্শী গুরুর নির্দেশ, অন্যদিকে বিশেষ ধরণের

যোগক্রিয়া মূলক সাধন-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হলে তখনি ঘটবে আত্মোপলব্ধি। আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে সাধক উত্তীর্ণ হবেন সাধন লোকের সর্বশেষ স্তরে। তখন স্বরূপের মধ্যে দিয়েই ধরা দেবেন অধরা পুরুষ।

স্বরূপ রূপে নয়ন দেরে
দেখবি যে রূপের রূপ,
কেমন সে রূপ ঝলক মারে।
স্বরূপ বিনে রূপ দেখা
সেতো কেবল মিথ্যে ধোঁকা
সাধকের লেখা জোখা
স্বরূপ শক্তি সাধন দ্বারে।
অবতার আর অবতরি
তুই রূপে যুগল তারই
তাহে রূপ চড়ন দাড়ি
রূপের রূপ বলি যারে।
শূন্য ধ্যানের ধ্বজা যেরূপ
তারে আজ ভাবি ও যেরূপ
সিরাজ সাঁই বলেরে রূপ
সাধবি লালন কেমন করে।

বাউল সাধন পন্থীদের মধ্যে সাধন-প্রণালীর খুঁটিনাটি নিয়ে মত বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরণের অভিজ্ঞতা পৃথিবীর সকল দেশের সকল ধর্মমত সম্পর্কেই প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, শাক্ত বৈষ্ণব ভেদাভেদ না রেখে বহু নরনারী এই ধর্মের শরণাগত হয়েও তারা সম্পূর্ণভাবে পূর্বের সংস্কার ভুলে যেতে পারেনি। এই কারণে তারা যখন বাউল বলে নিজেদের পরিচিতি দান করলো তখন সম্পূর্ণভাবে বাউল দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে নিঃশেষে মিশে যেতে পারেনি তাই হয়তো বা তাদের অজ্ঞাতসারেই

বাউল ধর্ম তাদের পূর্বসংস্কার লব্ধ ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল—এইজন্যে বাংলাদেশের এক অঞ্চলের বাউল-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর অঞ্চলের বাউল-পন্থীদের আচারগত বৈষম্য কিছু মাত্রায় হলেও ধরা পড়ে। এই বৈষম্যের কারণ হিসেবে আরো একটি বিষয়কে দায়ী করা চলে। বাউল ধর্মমত এবং সাধন-পদ্ধতি কোনো একটি গ্রন্থের আকারে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়নি—এই কারণে বাউল দর্শন ও ভাবধারার ব্যাখ্যাকর্তাদের মধ্যে স্বাধীনতার অনেকখানি অবকাশ ছিল।

এছাড়াও বাউল সাধকগণ বিভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যাদের গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন সেইসব গুরুদের নির্দেশের মধ্যেও অনিবার্যরূপে তারতম্য আত্মপ্রকাশ করেছিল। গুরুবাদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হওয়ার ফলে গুরুর নির্দেশকেই প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি প্রবণতা দেখা গিয়াছিল আর গুরুর নির্দেশকে প্রাধান্য দেবার ফলে বিভিন্ন গুরু পরিচালিত বাউল-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গিয়েছিল মত ও পথ নিয়ে বৈষম্য। কিন্তু এই বৈষম্য মূল বাউল সাধন তত্ত্বকে খর্ব করতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ছিল গৌণ, মূল তত্ত্বগত ঐক্য এবং সংহতি ছিল অব্যাহত।

বাউল গান নামে যে সব গান সম্প্রতিকালে সংগৃহিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে "নবীন বাউল" রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা—তাঁর প্রবন্ধে এবং কবিতায় একাধিকস্থানে তিনি বাউলদের সম্পর্কে তাঁর উৎসুক্য এবং বাউলগান বিষয়ে তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনায় আছে—

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি আমার লেখায় প্রকাশ করেছি শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউলদলের সঙ্গে আমাদের সদাসর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হতো। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলসুরের মিল

ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনও একসময়ে আমার মনের মধ্যে সহজভাবে বিঁধে গেছে।" এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রপুটের একটি কবিতায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

"কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে।
একলা প্রভাতের রৌদ্রে
সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙ্গে ফেলতো।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে শুধু বাউল সাধন-পন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেননি তিনি অপরকেও বাউলদের সান্নিধ্যলাভ ও তাঁদের রচিত গান সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। যাঁরা কবিগুরুর কাছ থেকে এ বিষয়ে নির্দেশ ও প্রেরণালাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম স্মরণযোগ্য তিনি স্বর্গগত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়। তিনি বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বহু শ্রম স্বীকার করে, বহু পল্লীসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত বিশেষ করে বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন। এই সংগ্রহ-কার্য উপলক্ষে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে বহু বাউল সাধকের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। এঁদের সান্নিধ্যলাভ করার পর থেকে তিনি শুধু বাউল গান সংগ্রহ করে নিশ্চেষ্ট থাকেন নি; বাংলার শিক্ষিত নরনারীর সঙ্গে বাংলার বিস্মৃত প্রায় লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বহু রচনা এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে বাউল-সাধক এবং বাউল-সঙ্গীতের প্রতি একটি সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসা জাগাতে চেয়েছিলেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন "হারামনি" নামে যে পল্লীগানের সংগ্রহ প্রকাশিত করেছেন তিনিও কবিগুরুর

আশীর্বাদে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে কবিগুরু লিখেছিলেন—"বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনাআপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন মহাশয় বাউল-সঙ্গীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ করছেন আমি তাঁর অভিনন্দন করি—সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করে নয়, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জন সাধারণের মধ্যে মানবচিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘ কাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেছে—তারই পরিচয় লাভ করবো এই আশা করে।"

সম্প্রতি কালে অন্যতম প্রসিদ্ধ বাউল-সাধক লালন ফকিরের একটি গীত সংগ্রহ ডক্টর মতিলাল দাশ ও পীযুষ কান্তি মহাপাত্রের সম্পাদনায় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগীতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে লালনশাহের মোট চারশো বাষট্টিটি গান স্থানলাভ করেছে। বাউল গান রচয়িতাদের মধ্যে লালন শাহ সর্বাধিক পরিচিত সুতরাং তাঁর গানের সংগ্রহ বাউল সঙ্গীতের প্রকৃতির উপর অনেকখানি আলোকসম্পাত করে বাউল-ধর্মের মূলতত্ত্বের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন—"বাংলার জনগণের নিম্ন কোটিতে প্রচলিত এবং প্রচারিত বাউল-ধর্ম ও বাউল গান আজ সর্বকোটির ধর্মসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণ যাহাতে এই গানগুলির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিতে পারেন সেইজন্য এই গান গুলিকে সাগ্রহে প্রকাশ করা হইল।"

আধুনিক কালে বাংলার বাউল বা গান সম্পর্কে সর্বাধিক প্রামান্য রচনা ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত বাংলার 'বাউল ও বাউল-গান' নামে সুপরিচিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার বাউল

শব্দের উৎপত্তি, বাউল গানের রূপ ও সাহিত্যিক মূল্য, বাউল ধর্মের আবির্ভাব, বাউল-গানের রচনা কাল, বাংলায় ধর্মের ক্রমবিবর্তনে বাউল ধর্মের উৎপত্তি ও স্থান, এই ধর্মমতের উপাদান ও সাধনা তন্ত্র, সুফী-ধর্ম এবং আর্যাবর্তের সন্তগণ প্রচারিত ধর্মমতের তুলনা-মূলক বিস্তৃত তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন। এছাড়া গ্রন্থকার বহু শ্রমে অপ্রকাশিত এবং প্রকাশিত বাউল গানের সঙ্কলন যোজনা করেছেন। পাঁচশতের বেশীগান এই বিরাট গ্রন্থখানির কলেবরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থখানি রচিত হওয়ায় শিক্ষিত বাঙালী নরনারী বাউল ঐতিহ্যের কথা কোনকালেই বিস্মৃতি হবেন না।

যে সব বাউল-সাধকের গান সর্বাধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণযোগ্য লালনশাহ ফকির। লালনশাহের জীবন বৃত্তান্তের খুঁটিনাটি তথ্য জানা সম্ভব নয়। তবু তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন জীবনী সংগ্রাহক যে সব তথ্য আহরণ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে লালনশাহ নদীয়ার অন্তঃর্গত কুষ্ঠিয়ার নিকটবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের অনুমান ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ তাঁর জন্মকাল। শৈশব থেকেই লালন ছিলেন ধর্মপ্রাণ, জাতিতে তিনি ছিলেন কায়স্থ। বাল্যকাল অতিক্রান্তহবার পূর্বে তিনি পিতৃহীন হন। অল্পবয়সে সেকালের প্রথা অনুসারে তাঁর বিবাহ হয়েছিল কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁর কোনো মোহই ছিল না। লালনশাহের মৃত্যুর পর কুষ্ঠিয়া থেকে একটি পাক্ষিক পত্রিকায় লালনশাহ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে মৃত্যুকালে লালনের বয়স ১১৬ বৎসর ছিল বলে বলা হয়েছে। প্রথম বয়সে তিনি পদব্রজে পুরী তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছিলেন—তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বগ্রামবাসী প্রতিবেশীরা।

কিন্তু পুরীধামে পৌঁছবার আগেই পথিমধ্যে তিনি রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর সহযাত্রীরা তাঁকে অসহায়ভাবে পথের প্রান্তে ফেলে রেখে চলে গেলেন। জ্ঞানহারা লালনশাহ সে খবর জানতে

পারলেন না। যেদিন তাঁর জ্ঞান হলো সেদিন তিনি দেখতে পেলেন এক মুসলমান ফকির তাঁকে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় দিয়েছেন এবং নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন তাঁর সেবা ও শুশ্রূষার ভার। এই মুসলমান ফকিরটির নাম সিরাজসাঁই। সিরাজের অক্লান্ত সেবায় লালন প্রাণে বেঁচে গেলেন কিন্তু দুরন্ত রোগের প্রকোপে তাঁকে একটি চক্ষু হারাতে হলো। দুঃসহ দুঃখ কষ্টের এই অগ্নি-পরীক্ষা থেকে সিরাজের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নবজন্ম পরিগ্রহ করলেন লালন। সিরাজ ছিলেন উচ্চাঙ্গের সাধক, প্রকৃত দরবেশের সব গুণই প্রতিফলিত হয়েছিল তার ব্যক্তিত্বে। মুসলমান ধর্মাবলম্বী হয়েও তিনি হিন্দুদের বহু তীর্থ পর্যটন করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মের সারতত্ত্ব অনুধাবন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। এই সিরাজকেই লালন ধর্মগুরু এবং দীক্ষাগুরু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

লালন সম্পর্কে জনশ্রুতি মূলক যে সব কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তা থেকে জানা যায় রোগমুক্তির পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু মুসলমানের গৃহে বসবাস করার ফলে তাঁর স্বগ্রামবাসীরা তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে চাইলেন না। এমন কি, নিজ পরিবারের মধ্যেও তাঁর স্থান হলো না। দুঃখে ও অভিমানে লালন গৃহত্যাগ করলেন। কিন্তু এই দুঃখবোধ তাঁর বেশীদিন রইল না। গৃহের ক্ষুদ্র সীমা থেকে তিনি উত্তীর্ণ হলেন পূর্ণতর জীবনের এক মহত্তর ক্ষেত্রে—আরম্ভ হলো তাঁর দেশে দেশে পর্যটন। সিরাজ সাঁই-এর কাছে সাধন পথে সিদ্ধিলাভের যে নির্দেশ তিনি পেয়েছেন তা তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারে আত্ম নিয়োগ করলেন। প্রচারের আঙ্গিক হিসেবে তিনি গ্রহণ করলেন গানের মাধ্যমে উপলব্ধ সত্যের প্রচার। তাঁর গান শ্রোতাদের কানের ভিতর দিয়া প্রবেশ করত মর্মস্থলে।

শিক্ষার আলোক থেকে যারা ছিল বঞ্চিত অথচ স্বভাবতঃ যাদের মন ছিল ধর্মোন্মুখ সেই অশিক্ষিত কিম্বা অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে লালনের আবেদন হলো অপ্রতিরোধ্য।

মুসলমান এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সম্প্রতি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীমতিলাল দাস ও শ্রীপিযুষকান্তি মহাপাত্রের যুগ্ম-সম্পাদনায় লালনশাহ ফকিরের গানের একটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আচার্য ক্ষিতিমোহন ও অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব লালনশাহের রচিত বহু গান সংগ্রহ করে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে বাউল-পন্থী সাধকের পরিচয় ঘটিয়েছেন। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণামূলক বাঙ্গলার বাউল ও বাউল গান নামক গ্রন্থে লালন-শাহ ফকিরের জীবনী এবং গান বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

লালনশাহের মৃত্যুর পর বাউল ফকিরদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেনং তিনি হলেন ফকির পাঞ্জ শাহ্। তিনি প্রায় একশো বছরের কিছু আগে যশোহর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে পাঞ্জ শাহ্ নানা সুফী সাধকদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সঙ্গে বহু বৈষ্ণব সাধকদেরও পরিচয় হয়েছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি জনৈক সুফী সাধকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সাধুজনোচিত সংযত জীবন যাপন করতেন এবং দেশ-দেশান্তর পর্যটন করে বাউল সাধনার মূলতত্ত্ব সর্বশ্রেণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। অবসর সময় তিনি গানও রচনা করতেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয়ের গ্রন্থে তাঁর গানের সংকলন আছে।

এ ছাড়া লালনের তিরোধানের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা বাউল-সাধক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপাল গোঁসাই, এরফানশাহ হাউড়ে গোঁসাই। এঁদের প্রত্যেকেরই গান বাংলার বাউল ও বাউলগান গ্রন্থে সযত্নে সংগৃহীত হয়েছে। এঁদের রচনা যদি রক্ষা করা সম্ভব না হতো তাহলে আমাদের দেশের ধর্মজীবনের এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ইতিহাসের অনেকখানি অলিখিত হয়ে থাকতো। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও

অনিবার্যরূপে মনে হয় যে আমাদের অমনোযোগীতা এবং বিস্মরণ প্রবণতার জন্য বাউলগানের বহু সংগ্রহ আমাদের রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষিত বাঙালী সমাজের ঔদাসিন্যে বাংলাদেশকে লোক-সাহিত্য এবং পল্লীসঙ্গীতের ঐশ্বর্যের সবটুকু পরিচয় পেতে দেয়নি।

লালন শাহের কয়েকটি গান—

(১)

আমার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়, দেখ না।

আমি ঢাকা, দিল্লী হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোর তো যায় না।
আত্মরূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা।
বেদ বেদান্ত পড়বি যত
বেড়বে তত লখনা।

আমি আমি কে বলে মন
যে জানে তার চরণ শরণ লও না।
সাঁই লালন বলে, মনের ঘোরে
হ'লাম চোখ থাকিতে কানা।

(২)

চল দেখি মন কোন দেশে যাবি।
অবিশ্বাস হলে কোথায় কি পাবি
এ দেশ ভূত পেতো বলে
সারে পোড়াও কয়তা দিল

পোড়ার ভূত, কোন দেশে গেলে
মুক্তি পায় কিসে ভাবি।

মন বোঝ না তীর্থ করা
মিছামিছি হেঁটে মরা
পোড়ার কাজ হয় পিড়েই সারা
নিষ্ঠা হয় মন যত্তপি।

বার ভাটি বাংলা জুড়ে
একই মাটি আছে পড়ে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ে
ঠিক দাও আপন নসিবী॥

(৩)

কোন দেশে যাবি মন চল দেখি যাই
কোথা পীর হও তুমি রে।
তীর্থে যাবি সেখানে কি পাপী নাইরে।
ও কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায়
স্বপ্ন দোষ কি হয়না সেথায়
আপন মনের বাঘে যাহারে খায়
কে ঠেকায় রে।

সঙ্গে আছে রিপু ষোলজন
তারা সদাই করে জ্বালাতন
যথা যাবি তথা ঘটাবে রে।
পাগল (ও কেউ) ভ্রমি পথে
পথ না খুঁজে পায় রে।
সিরাজ সাঁই কয়, লালন
তোরও বুদ্ধি নাইরে।

(৪)

কে গো জানবে তারে।
সামান্য অ-জপ মীনরূপে সাঁই আমার
খেলছে নীরে।
জগৎ জোড়া মীন অবতার
কারুণ্য বারির মাঝার
মান বুঝে কালাকাল বাঁধিলে
সে মীন ধরতে পারে।
আজব সীলে মানুষ গঙ্গায়
আলের উপর জলময়
যেদিন জল শুখাবে
সে জল হবে সব বিফল
মীন পালাবে অমনি শূণ্য ভরে।
মানুষ গঙ্গায় গভীর অথই হায়
দিলে তায় প্রেম রসিক ভাই,
দরবেশ সিরাজ সাঁইর বচন কহিছে লালন
আমি চুবনি খেলাম নেমে সেই কিনারে॥

(৫)

মন, তোর আপন বলতে কে আছে।
তুমি কার কাঁদায় কাঁদো মিছে।
সারা নিশি দেখ মনু রায়
নানান পক্ষী এক বৃক্ষে রয়,
খাবার বেলা কে কারে কয়
দেহ-প্রাণ তেমনি সে যে।
থাক সে ভবের ভাই বেরাদর
প্রাণ পাখী সে নয় আপনার,
পরের মায়ায় মজিয়ে এবার
প্রাপ্ত ধন হারায় পাছে॥

(৬)

গুরু বিনে কি ধন আছে।
কি ধন খুঁজিস খেপা কারো কাছে।
বিষয় ধনের ভরসা নাই
ধন বলতে ধন গুরু গোঁসাই
সে ধনের দিয়ে দোহাই
ভব তুফান যাবে বেঁচে।
পুত্র পরিবার বড় ধন
পেয়েছে এই ভবের ভূষণ
মায়ায় ভুল হয়ে অবোধ মন
গুরুধনকে ভাবলি মিছে।
কোন ধনের কি গুণপনা,
অন্তিমকালে যাবে জানা
গুরুধন এমন চিনলে না
নিদানে পস্তাবি পাছে।
গুরুধন অমূল্য ধন্‌রে
বুঝালে বুঝিস হাঁরে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরে
নিতান্ত পেঁচোয় পেয়েছে।

(৭)

শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক যে রে সাঁই
পড়িলে শুনিলে ফিরে তারে পাই।
(রোজ পূজা করিলে আপনি
মুখের কার্য কি হবে তেমনি
মনে ভাব তাই।)
ধ্যানী জ্ঞানী মুনি জনা
প্রেমের খাতায় সই পড়ে না,

প্রেম পিরিতির উপাসনা
কোন বেদে নাই।
প্রেমে পাপ কি পুণ্য হয়রে
চিত্রগুপ্ত লিখতে নারে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরে
তাই জানাই।

(৮)

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি বাঁধায়।
আমি সত্য না হলে
হয় গুরু সত্য কোন কালে
আমি যেরূপ দেখি নাই
সেরূপ দীন দয়াময়।
আত্মারূপে সেই অধর
সঙ্গী অংশ কলা তার
ভেদ না জেনে বনে বনে
ফিরলে কি হয়।
আপনারে আপনি চিনিনে
কিরূপ আছি কোনখানে
লালন বলে, অন্তিমকালে
নাইরে উপায়।

(৯)

বল কারে খুঁজিস কারে দেশ-বিদেশে
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনায়াসে
দড়দড়ি দিল্লী লাহোর
আপনার কোলে রয় ঘোর
নিরূপ আলেক সাঁই মোর
আত্মারূপ সে।

যে লীলে ব্রহ্মাণ্ডের পর
সেই লীলে ভাণ্ড মাঝার
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার
মেঘের পাশে।
আপনাকে আপনি চেনা
সেই বটে উপাসনা
লালন কয়, আলেক চেনা
হয় তার দিশে ॥

(১০)

সোনার মানুষ ভাসছে রসে
যে জেনেছে রসপান্তি সেই
দেখিতে পায় অনায়াসে।
তিনশ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ডে ভেদি
তার মাঝে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।
মাতা পিতার নাই ঠিকানা
অচিন দেশে বসতখানা
আজগুবি তার আওনা-যানা
কারণ বারির যোগ বিশ্বাসে।
অমাবস্যে চন্দ্র উদয়
দেখনা যার বাসনা হৃদয়
লালন বলে থাকো সদায়
ত্রিবেণীতে থাকো বসে ॥

(১১)

কি এক অচিন পাখী পুষলাম খাঁচায়
না হলো জনম ভরে তার পরিচয়
পাখী রাম রহিম বুলি বলে

ধরে সে অনন্ত লীলে
বলো তারে কে চিনিলে
বলো গো নিশ্চয়।
আঁখির কোনায় পাখির বাসা
দেখতে নারে কি তামাসা
আমার এই আদলা দশা
কে আর ঘুচায়।
যারে সাথে সাথে লয়ে ফিরি
তারে যদি চিনতে নারি
লালন কয় অধর ধরি
কেমন ধ্বজায়।

(১২)

আছে মায়ের ওতে জগৎ পিতা ভেবে দেখ না
হেলা করো না, বেলা মেরো না।
কোরাণে তার ইশারা দেয়
আলেক যেমন নামে লুকায়
তেমনি আকারে সাকার ঝাপা রয়
সামান্যে কি যায় জানা।

১০

নিষ্কামী নির্ব্বিকার হয়ে
দাঁড়াও মায়ের স্মরণ লয়ে
বর্ত্তমানে দেখ চেয়ে
স্বরূপে রূপ নিশানা।
কেমন পিতা কেমন মা সে
চিরদিন সাগরে ভাসে
লালন বলে করো দিশে
ঘরের মাঝে ঘরখানা॥

(১৩)

আছে দিন দুনিয়ার মানুষ একজনা
কাজের বেলায় পরশ মনি—আর সময় কেউ চেনে না।
নবী আমি এই দু'জনে
কলমা দাতা দল আর কিনে
বে কলমায় যে অচিন জনে
পীরের পীর হয় চেন না।

যেদিন সাঁই নরেকারে
ভাসলেন একা একেশ্বরে
সেই অচিন মানুষ তারে
দোসর হ'ল ততখানা।

কেউ তারে জেনেছে দড়
খোদার ছোট নবীর বড়
লালন বলে নড়চড়
সে নইলে কুল পাবা না।

ঘরে বাস করি সে ঘরের খবর নাই
চার যুগের ঘর চাবি আঁটা ছোড়ান পরের ঠাঁই।
ঘর ছেড়ে ধন বাইরে খোঁজা
বয় সে যেমন চিনির বোঝা
পায়নারে সে চিনির মজা
বলদ যেই ছাই।
কলকাটি যার পরের হাতে
তার ক্ষমতা কি জগতে
লেনা দেনা দিবা রেতে
পরে পরে ভাই।
একি বেহাত আপন ঘরে
থাক্‌তে রতন হই দরিদ্রে
দেখ্‌ সে রতন হাতে ধরে
তারে কোথায় পাই।
পর দিয়ে পর ধরাধরি
সে পর কৈ চিন্তে পারি
লালন বলে, হায় কি করি
না দেখি উপায়॥

(১৫)

মরো জেন্দেগির আগে।
দেখে শমন যাক ভেগে।
সই থাকিতে আগে মরা
ভাবুক তার এমনি ধারা
প্রেম মদে মাতোয়ারা
সে কি বিধির ভয় রাখে।
মরে যদি ভেসে ওঠে
সেও বেড়ায় ঘাটে ঘাটে
মরে অমনি ডোব শ্রীপাটে
বিধির অধিকার ত্যেগে।
হায়াতের আগে যে মরে
বাঁচে সে মওতের জোরে
দেখরে মন হিসাব করে
দরবেশ লালন কয় ডেকে॥
